SHARODIYA LIPIKA

শারদীয়া লিপিকা

OCTOBER 2020
কার্ত্তিক ১৪২৭

VOLUME 14 AUTUMN ISSUE
চতুর্দশ বর্ষ শারদীয়া সংখ্যা

EDITOR
DR. JHARNA CHATERJEE

COORDINATOR
ADITYA CHAKRAVARTI

WEB MASTER
SOMESH ROYCHOUDHURY
SOUMMYO PRIYO CHATTOPADHYAY

COVER DESIGN
REETO GHOSH
OISHEE GHOSH

Lord Ganesh

Debabrata Mukherjee

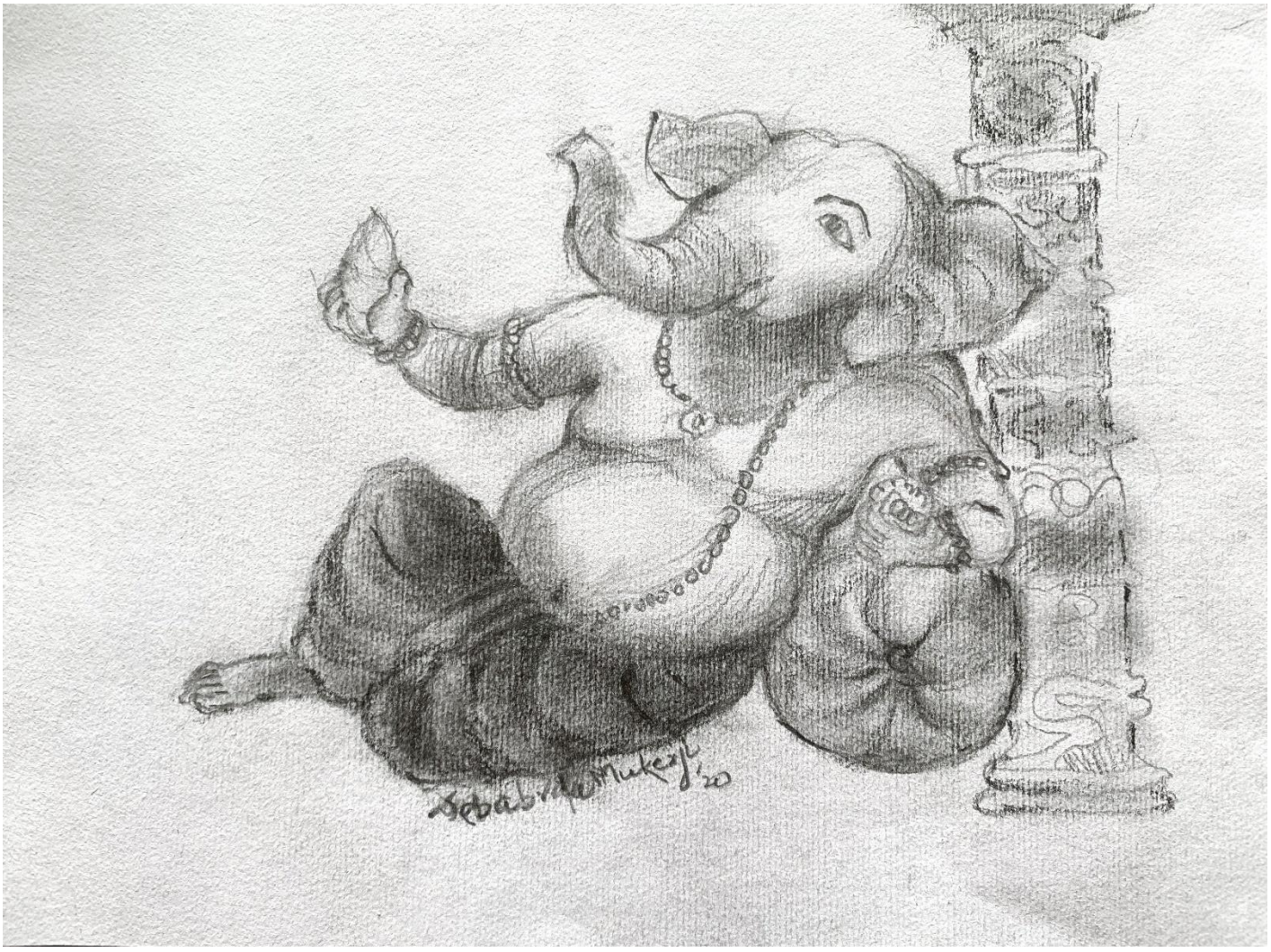

সম্পাদকীয় \ Editorial

প্রিয় লিপিকার বন্ধুমহল,

এবারকার লিপিকাতেও আমরা পেয়েছি কিছু উপভোগ্য লেখা ও ছবি। করোনা-ভাইরাসের উপদ্রবে আমরা কাগজের 'লিপিকা' প্রকাশ করতে পারলাম না, সবার কাছে তার জন্য ক্ষমা চাইছি। এ বছরে এই পত্রিকা শুধু ই-পত্রিকা হিসাবেই আত্মপ্রকাশ করবে।

শারদীয়া দুর্গাপূজা বাঙালির মনকে চিরদিনই উদাস করে দেয়, সে কাশের বনে দোলা দেখেই হোক আর অটোয়ার বনে কমলা-লাল-হলুদের উচ্ছাস দেখেই হোক। তবে যে ভাবে আর যেখানেই দুর্গাপূজা আমরা পালন করি না কেন, ঐ কটি দিন আমাদের পরম-উৎসবের দিন।

লিপিকার পক্ষ থেকে সবাইকে দুর্গাপূজায় আমাদের আন্তরিক শুভকামনা জানাই।

ঝর্ণা চ্যাটার্জী,

সম্পাদিকা (সাথে আদিত্য চক্রবর্তী, পরিচালক)

Dear Lipika friends,

Like previous years, we have been blessed again with a few enjoyable contributions - both literary and artistic - from our members. This year has given us a different challenge to contend with - due to coronavirus pandemic. We decided not to print Lipika this year, and to publish it only as an E-magazine. Our apologies for that.

Durga Puja days are festive to all Bengali people regardless of which corner of the world we are in, and how the emotion is stirred in our hearts.

On behalf of the Lipika team, we wish all of you the best.

Jharna Chatterjee

Editor, Lipika (with Aditya Chakravarty, Coordinator)

Lipika team is not responsible for the content or opinion expressed by any wrier.
লিপিকা সম্পাদিকা বা পরিচালক পত্রিকায় প্রকাশিত কোন তথ্য বা মতামতের জন্য দায়ী নন।

****** সূচীপত্র Contents ******

লিপিকা

কার্ত্তিক ১৪২৭ চতুর্দশ বর্ষ শারদীয়া সংখ্যা

October 2020 Volume 14 Autum Issue

Lord Ganesh	Debabrata Mukherjee	1
সম্পাদকীয় \ Editorial	From the Editor	2
সূচীপত্র / Contents		3
মেনকার দুঃখ	সুপর্ণা মজুমদার	4
কিলডিয়ার (Killdeer) দিল-দিয়ার (Dil-Dear)	মদনমোহন ঘোষ	6
বেঁচে থাক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে	সংঘমিত্রা চক্রবর্তী	10
যখন বৃষ্টি আসে	অনিন্দ্য গাঙ্গুলী	17
এখনকার যত যা তা গল্প	আদিত্য চক্রবর্তী	19
দুটো কবিতা	ডক্টর ঝর্ণা চ্যাটার্জী	23
সুরের জালে	রাজশ্রী সেনগুপ্ত	26
পথের সারথী	সুভাষ চন্দ্র বিশ্বাস	28
স্মৃতিচারণ	আদিত্য চক্রবর্তী	29
পূজোর মেলা	অরুণ শংকর রায়	35
হিজিবিজি বিদ্যা	হাসু ঘোষ	37
মাউন্টিদের সাথে কয়েক বছর	ডক্টর ঝর্ণা চ্যাটার্জী	41
Calcutta: The British Gateway to India	Sourendra K. Banerjee	46
An Oasis in the Paddy Fields	Subhash C. Biswas	59
Living Bhoots in my home and garden in Ottawa	Dr. Nirmal Kumar Sinha	66
Ganges Cruise	Yogadhish Das	71
Sherlock Holmes in Old Town, Riga	Subhalakshmi Basu Ray	77
Mandu	Subhash C. Biswas	79
Reclaiming Indigenous Culture on a Canvas	Reeto Ghosh	86
My foray into nature	Oishee Ghosh	87
Alpona	Nirmal Kumar Sinha	89
কোথায় গেলে তারে পাবো	দেবব্রত মুখার্জী	90
Lily - acrylic on canvas	Arun Shankar Roy	91
A Man of Conscience	Reeto Ghosh	92
Laugh your heart out	Various collections	93
Rapid River, Quebec, Acrylic on canvas	Shila Biswas	99

মেনকার দুঃখ

সুপর্ণা মজুমদার

এবার আমার উমা এলে বলবো সবই খোলাখুলি -
মনের মাঝে এত দিনের জমিয়ে রাখা কথাগুলি ।

তোমার বাবা গিরিরাজের বয়স তো আর কম নয় !
Retire করে আয় কমেছে। করলো খানিক নয় ছয়
টাকাকড়ি ভাইটি তোমার উড়নচণ্ডে মৈনাক ।
বলতে গেলে মহাভারত। সেসব কথা না হয় থাক ।
মহেশ্বরের ছত্র ছায়ায় তুমি মাগো আছো সুখে ;
অন্নপূর্ণা হয়ে তুমি অন্ন যোগাও সবার মুখে ।
Talented সব ছেলে মেয়ে, বড় বড় চার চারটি -
বুড়ো বুড়ির খবর নিতে আসেওনা কেউ একবারটি ।
বাঙালি দের আবদারেতে সম্বৎসরে একটিবার -
বাপের বাড়ি visit কর - week end দেখে দিন তিন চার ।
সঙ্গে আসে ছেলেমেয়ে, ওরাতো আর ছোটটি নেই ।
বিয়ের বয়স পেরিয়ে গেল, move out করার নামটি নেই ।
লোকের মুখে শুনি প্রায়ই, লক্ষীর নাকি ভালো বিয়ে -
শ্রী জনার্দন স্বামী তাহার। সবি ভালো, তবে ইয়ে -
কাজের মধ্যে বসে শুধু লক্ষী করেন পদসেবা,
এটা কেমন Life style! সেই কথাটা বলে কেবা !
গণপতি বাবাজীবন, health এর দিকে নজরই নেই
করে সবাই হাসাহাসি ওই ভুঁড়ির দিকে তাকালেই ।
ফুলবাবুটি কার্তিকেয় পা বাড়িয়ে আছেন যেন,
হলেই কোথাও মারামারি, উনি সদাই ready জেনো ।
"অন্য পাড়ার" মেয়েরা সব ওকেই নাকি পূজো করে?
মন্দ লোকের কাজ নেইকো মন্দ কথা বলে মরে ।

ওরই মধ্যে সরস্বতী- শান্তশিষ্ট নাতনী আমার,
দেবী তিনি লেখা পড়ার, শিল্প এবং সা রে গা মা র।
ওসব এখন obsolete, চলছে লারেলাপ্পা গান -

লেখাপড়ার নাম নেইকো, six figure টি আগেই চান
লক্ষী ছাড়া, আর কারো কদর নেইকো তেমন মর্ত ধামে
দুর্গা পূজো করছে বটে, কেবল ফুর্তি করার নামে ।

আগে আগে সারা বছর কাটতো শুধু আশা নিয়ে -
উমা আমার আসবে ঘরে সোনার নূপুর পায়ে দিয়ে ।
ঝলমলিয়ে উঠবে হেসে গিরিরাজের আঁধার গেহ
চারটি দিনের তরে ও মা । দুখিনি এই মায়ের স্নেহ
দিতাম তোমায় উজাড় করে। সেদিন এখন বহু দূরে
তুমিও মাগো পালটে গেছো, আমরা বাজি বেসুর সুরে ।

বাড়লো যেমন family তোমার, আমরা দুজন হলাম বুড়ো -
অত জনের বাসমতী চাল, পাঁঠার মাংস, মাছের মুড়ো
কোথায় যে পাই! এখন যে তাই মহালয়ার পরে পরেই -
আমার বুকে palpitation, গিরিরাজ তো পড়েন জ্বরেই ।

বলবো আমি আমার কথা - দুঃখ তুমি পাও বা না পাও -
সবার মেয়ে মাকে দেখে, তুমি তো মা ফিরেও না চাও ।
বলবো এসব গৌরী মাকে, আমার মনের যত কথা -
মেয়ে আমার বুঝবে না কি মা মেনকার মনের ব্যথা?

কিলডিয়ার (Killdeer) দিল-দিয়ার (Dil-Dear)

মদনমোহন ঘোষ

ফটো*: CBC News, June 27, 2018.*

দু-বছর আগের ঘটনা। অফিস থেকে প্রতিদিনের মতো বাড়ি ফিরছিলাম। রেডিওতে একটা ব্রেকিং নিউজ আমাকে বেশ কৌতুহলী করে তুলল। রেডিওর ভল্যুমটা বাড়িয়ে দিলাম খবরটা আরও ভালভাবে শোনার জন্য। বিষয়টা হল, চারটে পাখির-ডিমের নিরাপত্তার জন্য অটোয়াতে এবার ব্লুসফেষ্ট বন্ধের মুখে। লাব্রেটন ফ্ল্যাটসে, যেখানে ব্লুসফেষ্টের মূল মঞ্চ তৈরী হয়ে থাকে সেখানে একটা পাখির বাসা আর তাতে চারটে ডিম দেখা গেছে। শুধু তাই নয়। একটা পাখি ঐ ডিমে তা দিচ্ছে আর অন্য একটা পাখি রক্ষীর মতো ওদের পাহারা দিচ্ছে। এই অবস্থায় মঞ্চ তৈরীর জন্য পাখির বাসাটাকে সরালে পাখির ডিম ফুটে বাচ্চা হওয়াতে বিশেষ আশঙ্কা বা ঝুঁকি আছে। তাই ওটাকে সরানো যাবে না। আর না সরালে অনুষ্ঠান হবে কি করে। হাজার হাজার মানুষ ছ-মাস আগে টিকিট কেটে অপেক্ষা করছেন তাদের প্রিয় শিল্পীদের গান শোনার জন্য। দেশবিদেশের বিশিষ্ট শিল্পীদের নিয়ে এই অনুষ্ঠান এমন সংকটে কখনও পড়েনি।

ব্লুসফেষ্টের আর দেরি নেই, তাইতো মঞ্চ তৈরীর কাজ শুরু হয়েছে। কবে ডিম থেকে বাচ্চা হবে তার কোন ঠিক নেই। সাধারণত হ্যাচিং পিরিয়ড ছোট পাখিদের ন্যূনতম ১০ দিন আর বড় পাখিদের ক্ষেত্রে দীর্ঘ চার সপ্তাহ পর্যন্ত হতে পারে। কর্মকর্তা তথা সংগীতানুরাগীদের মাথায় হাত। নামী জ্ঞানী শিল্পীদের সঙ্গে একবছর আগেই এগ্রিমেন্ট হয়েছে। কয়েক মিলিয়ন ডলারের টিকিটও বিক্রি হয়েছে। এমন অবস্থায় কি যে হবে তা নিয়ে নানান জল্পনা কল্পনা শুরু হয়েছে। অটোয়ার বাৎসরিক এই অনুষ্ঠানটি খুবই জনপ্রিয় বিশেষ করে একটু কমবয়সী সংগীতানুরাগী ছেলেমেয়েদের কাছে। জুনের প্রায় শেষ, আর সপ্তাখানেকের মধ্যেই অনুষ্ঠান শুরুর কথা। চলবে দশ-এগারো দিন ধরে। বিশেষ শিল্পীদের মধ্যে আসছেন, ফু ফাইটার্স, বেক, ডেভ ম্যাথিউস ব্যান্ড, এবং স্টারগিল সিম্পসন ইলেকট্রিক বিলের শীর্ষস্থানীয়া। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য শিল্পীদের মধ্যে আছেন ব্রায়ান অ্যাডামস, দ্য ওয়ার অন ড্রাগস, কোর্টনি বার্নেট, রাই সেমুমুর, ব্রকহ্যাম্পটন, ক্রোমো, গ্রেটা ভ্যান ফ্লিট, শ্যাগী, বেঞ্জামিন বুকার, এবং লস স্ট্রেইটজ্যাকেটস সহ নিক লোয়ে।

মূলত ব্লুস সংগীতকে কেন্দ্র করে অটোয়াতে ১৯৯৪ সালে এই অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। মেজরস্ হিল পার্কে এই অনুষ্ঠানে সে বছর পাঁচ হাজার লোক হয়েছিল। ক্রমশই জনপ্রিয়তার প্রসার হয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে এর সঙ্গে ক্রমবর্ধমানভাবে যোগ হয়েছ মেইনস্ট্রিম পপ, হিপহপ, রেগি এবং রক। এখন ব্লুসফেস্ট কানাডার বৃহত্তম ব্লুস ফেস্টিভাল এবং উত্তর আমেরিকার দ্বিতীয় বৃহত্তম উৎসবে পরিণত হয়েছে। জনপ্রিয়তার কারণে অনুষ্ঠানের স্থান পরিবর্তন করতে হয়েছে তা বহু বছর হয়ে গেল। ইদানীংকালে শ্রোতৃমণ্ডলীর সংখ্যা তিন লাখ ছাড়িয়ে যায়। ২০০৭ সাল থেকে লাব্রেটন ফ্ল্যাটসের ফাঁকা এই তিন-চার একর জায়গায় প্রতি বছরই জুলাই মাসে এই অনুষ্ঠানটা হয়। কেনেডিয়ান ওয়ার মিউজিয়ামের পাশের এই জায়গাটাকে পুরোপুরি ঘিরে ফেলা হয়। কয়েকদিনের জন্য গড়ে ওঠে একাধিক অস্থায়ী মঞ্চ।

কিছুদিন আগেও জায়গাটা সাদা বরফে ঢাকা ছিল। কিন্তু বসন্তের মাঝামাঝি বরফ গলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মাঠ ভরে গেছে ঘন সবুজ ঘাসে কোথাও বা অবাঞ্ছিত আগাছায়। মাঠের মাঝে মাঝে রুক্ষ দাবদাহে সোনালি ঘাস দেখা যাচ্ছে বিশ্ব উষ্ণায়নের ফল হিসাবে। মনে পড়ে বছর বিশেক আগেও বাড়িতে এয়ার কন্ডিশনিং (এসি) লাগতো গ্রীষ্মের শেষ কয়েক দিনে। আর এখন বসন্তের শেষ হতে না হতেই এসি চালাতে হয়। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে ক্যানাডার কয়েকটা শহরে উচ্চ তাপমাত্রার কারণে প্রতি বছর শত শত মানুষ মারা যান। অবশ্য এর পেছনে এঁদের কো-মর্বিডিটিও অন্যতম কারণ। আশ্চর্যের কথা হল শীত প্রধান এই দেশে কোনও কোনও শহরে রেন্টাল প্রোপার্টি বা সিনিয়র্স হোমেও উচ্চতম তাপমাত্রার কোন সীমা বাঁধা হয়নি। তাই প্রোপার্টি ওউনাররা ঘরে ভাড়াটেদের জন্য এসি দিতে বাধ্য নন। তবে নিম্নতম তাপমাত্রা আইনগত ভাবে বেঁধে দেওয়া হয়েছে। বিশ্ব উষ্ণায়নের কথা তখন চিন্তার বাইরে ছিল।

এদিন সকাল থেকেই জন ফ্রান্সিস তার বিশাল লন মোয়ার নিয়ে ঘাস কাটছিলেন। কেউ বা আগাছা পরিষ্কার করছেন। একই সঙ্গে আবার বড় বড় ট্রাক থেকে স্টেজ তৈরীর লাম্বার নামানোও চলছে।

হঠাৎ দেখা গেল দুটো পাখি জন ফ্রান্সিসের মাথার উপর দিয়ে যাওয়া আসা করছে। ওদের তীব্র আর্তনাদে সব কর্মকাণ্ড থেমে গেল। জন বেপরোয়া ভাবে বেড়ে ওঠা ঘাসের মধ্যে কিছু একটা লক্ষ্য করে মোয়ারটা থামালেন। আশপাশে কর্মরত সহকর্মীরাও ঘাবড়ে গেলেন। "কি হয়েছে? সবকিছু ঠিক আছে তো?" জন বলল, "সামনে একটা পাখির বাসা। তাই..." সত্যিই তো, সামনে একটা পাখির বাসা। বাসার মধ্যে চারটে ডিমও রয়েছে। অনুষ্ঠানের পরিচালক মার্ক মোনাহেমকে জানাতেই উনি সমস্ত কর্মীদের ওখান থেকে দূরে সরে যেতে বললেন। ওখানে কোনও ধরনের কাজ বন্ধ করে দিলেন। কি সমস্যা! এখানেই তৈরী হবে অনুষ্ঠানের প্রধান মঞ্চ। মাঠের বাকি জায়গা প্রায় পরিষ্কার হয়ে গেছে। জন কাজ বন্ধ করে একটু সরে যেতেই একটা পাখি বাসায় চলে এলো। সে ডিমের উপর বসল। আসলে সে ডিমে তা দিচ্ছে। অন্য পাখিটা পাশেই একটা গাছের ডালে বসে আছে। অনুষ্ঠান কর্তৃপক্ষের নির্দেশে পাখিদের যাতে কোন রকমের ব্যাঘাত না ঘটে তার জন্য ২৪ ঘন্টার জন্য পাহারাদার নিয়োগ করা হল।

খুব কম সময়েই ঘটনাটা কানাডার জাতীয় স্তর অতিক্রম করে আন্তর্জাতিক দৃষ্টি আকর্ষণ করল। কানাডিয়ান রেডিও, সি.এন.এন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ওয়াশিংটন পোস্ট এবং দ্য গার্ডিয়ানে স্থান পেল। এদেশে পশুপক্ষী-ভক্ত মানুষের অভাব নেই। পশুর অধিকার নিয়ে সংগঠন ও আছে। সমস্যার সমাধানের জন্য এনভায়রণমেন্ট ক্যানাডা ও ন্যাশনাল ক্যাপিটল কমিশনের জীববিজ্ঞানীরা জরুরী তৎপরতায় কাজ করছেন ঠিকই কিন্তু তবু সময় তো একটু লাগবে। পাখিটা কবে থেকে ডিমে তা দিচ্ছে, হ্যাচিং পিরিয়ড কত দিনের। এই মুহূর্তে কোন রকমের ব্যাঘাত পক্ষী-ছানার জন্য ক্ষতিকর হবে কিনা। ওরা নির্লোপ-প্রায় গোষ্ঠীর পাখি কিনা। পাখির বাসাটাকে ওখান থেকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়া যাবে কিনা। এছাড়া আরও কত কিছু তাঁরা অনুসন্ধান ও গবেষণা করছেন তাঁরা।

দেখতে দেখতে তিন দিন কেটে গেল। মাঝে ছুটির দিনেও সরকারী বিজ্ঞানীরা সমস্যার সমাধানের জন্য কাজ করেছেন। জানা গেল ওই পাখিদের নাম কিলডিয়ার (Killdeer)। আয়তনে ছোট, অনেকটা দোয়েল পাখির মত দেখতে। না, না ওরা নির্লোপ-প্রায় গোষ্ঠীর নয়। তবে মাইগ্রেটরি বার্ড হিসেবে ওদের সুরক্ষা আবশ্যিক! ক্যানাডাতে এ নিয়ে বিশেষ আইন আছে। অবশেষে এনভায়রণমেন্ট ক্যানাডা কয়েকটা বিশেষ শর্তে বাসাটাকে ওখান থেকে পঁচিশ মিটার দূরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিল। এর থেকে বেশী দূরে নিয়ে গেলে পাখি দুটো ওই বাসায় ফিরে নাও আসতে পারে। আর তা হলে ডিমের ভেতরের নিকট ভবিষ্যতের পাখিদের আর পৃথিবীর আলো দেখা হবে না। পাখিদের জগত মনুষ্য সমাজের এই 'মূল্যহীনতাকে' ধিক্কার জানাবে।

শর্ত মেনেই আসল অভিযান শুরু হল। ওডেনের ওয়িনল্যান্ডস বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য নির্বাহী পরিচালক মনিকা মেলাইকার স্বয়ং এসেছেন তাঁর সহকর্মীদের নিয়ে এই অভিযানের নেতৃত্ব দিতে। তিনি বললেন, "কাজটা করতে হবে খুব সন্তর্পণে। ভয়ের বিষয় হলো মানুষের সংস্পর্শে বেশীক্ষণ থাকলে পাখিদুটো ওদের ডিমগুলোকে পুরোপুরি বর্জন করতে পারে।" মাটিতে বাসা ও ডিমগুলো যেরকম ভাবে ছিল সেই রকম পরিবেশ সৃষ্টি করে একটা প্লাটফর্ম বানানো হল। তারপর বাসা ও

ডিম রেখে সবাই ওখান থেকে সরে গেলেন। সবাই সরে যেতেই পাখিরা আবার বাসায় ফিরে এলো। মেলাইকার ও তাঁর সহকর্মীরা একটু স্বস্তি প্রকাশ করলেন। "যাক, আমরা প্রথম ধাপে সফল। ওরা নতুন জায়গায় ওদের বাসাটাকে মেনে নিয়েছে। এর পর ধাপে ধাপে ওটাকে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে।"

বিকেল তখন পাঁচটা, সরানোর কাজ শুরু হল। প্রতি ধাপে মাত্র এক মিটার সরানো যাবে। দুই ধাপের মাঝে অন্তত কুড়ি মিনিটের ব্যবধান রাখতে হবে। অন্যতম শর্ত হল পরের ধাপে সরানোর আগে অন্তত একটা পাখিকে তার বাসায় ফিরে আসার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। এবং তার পর কিছুক্ষণ তা দেওয়ার জন্য সময় দিতে হবে। এ এক কঠিন অভিযান। যদি পাখিরা এদের এই পদ্ধতি অনুসরণ না করে বা তাদের কৃত্রিম বাসাতে আর ফিরে না আসে; কিম্বা নতুন জায়গা এদের পছন্দ না হয়! কত রকমের অনিশ্চয়তা রয়েছে। এটা যেন মানুষ আর পাখির এক অতি স্পর্শকাতর খেলা। তবে সবকিছুর মূলে পিতা-মাতা আর সন্তানের যে অমোঘ টান, সেটাই আসল। এতেই সৃষ্টি, এতেই জয়। তবু ঝুঁকি সবসময়ই থাকে। তাই ঝুঁকি কমানোর জন্য ব্যাকআপ পরিকল্পনা আছে। মিসেস মেলাইকার সঙ্গে এনেছেন ইনকিউবেটর। যদি কোনও ভাবে পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়, তবে ইনকিউবেটরে ডিম থেকে বাচ্চা ফুটবে এবং বাচ্চাদের মিন্ডেন অভয়ারণ্যে স্থান হবে।

প্রথমবার ডিম সহ বাসাটাকে সরানো হল। সরানোর সময় পাখিদুটো মাথার উপর দিয়ে কাতর আর্তনাদ করতে লাগল। স্থানান্তরের পর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একটা পাখি চলে এলো। পাখিটা ওর ডিমগুলোকে ঢেকে বসল। ডিমগুলোকে ফিরে পেয়ে ওদের চিৎকার থেমে গেল। সেদিন আট ধাপে আট মিটার সরাতেই সন্ধ্যে নামল। প্রতিবারেই পাখীরা ওদের বাসায় ফিরে এসেছিল। তবে পাখিদুটোকে বড্ড অসহায় ও ত্রস্ত মনে হচ্ছিল। ওদিনের জন্য অভিযান মুলতবি হল। পরেরদিন সকালে বাকি অভিযান শেষ হল। কিলডিয়ার দুটো তাদের চার সন্তানকে পৃথিবীর আলো দেখানোর সংগ্রামে অটুট থাকল। মিসেস মেলাইকার ও তাঁর সঙ্গীরা তাঁদের ধৈর্য্যের পরীক্ষায় জয়ী হলেন।

দু-এক দিনের মধ্যেই ডিম ফুটে তিনটে বাচ্চা বের হল। পাখি দুটো অপেক্ষা করছে চতুর্থটার জন্য। ইতি মধ্যে বাচ্চা তিনটে উড়তে শুরু করল। মা-বাবা আর ছানাগুলো কিছুক্ষণ ওড়ে। একে অপরের থেকে দূরে চলে যায়। আবার কাছে চলে আসে। একে অপরকে ফিরে পায়। এই লুকোচুরি খেলার মাঝে বাচ্চাগুলো হারিয়ে গেল। ওরা চলে গেল দূরে কোথাও। কে জানে আর কখনও ওরা একত্রিত হবে কিনা। মা ও বাবা পাখি বাসায় ফিরে এলো। না, চতুর্থ ডিমটি তখনও ফোটেনি। আর কত অপেক্ষা করবে ওরা। এমনটি তো হয়না। পাখি দুটো একে অপরকে কিছু বলল। ডিমটাকে ভালভাবে দেখল, ঠোঁট দিয়ে আদর করল। তারপর ওই বাসা ছেড়ে ওরাও কোথায় হারিয়ে গেল। আর দেখা গেল না। সন্ধ্যা নেমে এলো।

আহা, ঠিক পরের দিন ওই ডিম থেকে আর একটা বাচ্চা হল। কিন্তু ততক্ষণে মা-বাবা ওদের ভাইবোন ওই বাসা ছেড়ে কে কোথায় চলে গেছে কে জানে। ছানাটাকে ওয়িনল্যান্ডস বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যে রাখা হল যতক্ষণ না ওরা উড়তে সক্ষম হয়। দিল উজাড় করে দেওয়া এই 'দিল-ডিয়ার' পাখিদুটো কখনো তাদের এই সন্তানের সাথে মিলিত হতে পারবে কি?

বেঁচে থাক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে

(দ্বিশতবর্ষের আলোয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর)

সংঘমিত্রা চক্রবর্তী

একজন মানুষ বিচার্য হন তাঁর identity বা পরিচিতি দ্বারা। সেই পরিচিতি বা identity তাঁকে দেয় একই সঙ্গে বিশিষ্টতা ও বৈচিত্র্য। বিশেষ করে প্রতিভাশালী মানুষদের ক্ষেত্রে এই identity বা পরিচিতি একমাত্রিক না হয়ে হয় বহুমাত্রিক যা তাঁদের করে তোলে স্বতন্ত্র ও অনন্য।

আমাদের বঙ্গভূমিতে উনবিংশ শতাব্দী এক দিকনির্ণয়কারী শতাব্দী। এটি এক নবজাগরণের যুগ। এই যুগে আমরা পেয়েছি রাজা রামমোহন রায়ের মতো, প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের মতো বহুমুখী পরিচিতির মানুষদের। রামমোহনের জন্ম ১৭৭২ সালে। দ্বারকানাথ জন্মগ্রহন করেন আর কিছুকাল পরে ১৭৯৪ সালে। রাজা রামমোহন ছিলেন একাধারে সমাজ সংস্কারক, ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠাতা, শিক্ষাবিদ। তিনি যেমন কাজ করেছেন সতীদাহ প্রথা বিলোপ সাধনে, বহুবিবাহ, শিশুবিবাহ রোধে তেমনি ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ স্থাপনেও তাঁর উদ্যোগ ও কম ছিলনা। সংস্কৃত,আরবী,ফারসী ভাষায় সুপণ্ডিত এই ব্যক্তিটি ইংরিজি শিক্ষা করেন বারো বৎসর বয়সে।

প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর ছিলেন ইংরিজিতে যাকে বলে entrepreneur তাই। বাংলায় একে বলা যেতে পারে উদ্যোগপতি। কতরকম ব্যবসা যে তিনি করেছেন! বিখ্যাত জাহাজ কোম্পানি কার এণ্ড টেগোরের কর্নধার ছিলেন তিনি। এই কোম্পানি অবশ্য নীলচাষ, আফিম প্রভৃতি ব্যবসাও দেখতো। আমাদের দেশে প্রথম ব্যাংকও প্রতিষ্ঠা করেন তিনি। ১৮২৯ সালে কলকাতায় তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন ইউনিয়ন ব্যাংক অফ্ ইণ্ডিয়া।

আরো একজন ক্ষণজন্মা মানুষের কথা না বললেই নয়। তিনি হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও। জন্ম ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে। হিন্দু কলেজের এই তরুণ শিক্ষক ছিলেন প্রখর যুক্তিবাদ ও স্বাধীন চিন্তার প্রবক্তা। তাঁর অনুগামীরা পরিচিত ছিলেন young Bengal নামে।

এটি মনে হওয়া স্বাভাবিক ধান ভানতে শিবের গীতের মতো বিদ্যাসাগরকে নিয়ে কথা বলতে গিয়ে এঁদের প্রসঙ্গ টানা কেন। আসলে প্রতিমার পিছনে যেমন চালচিত্র থাকে এঁরাও সেরকম বহু যত্ন করে রচনা করেছেন ঈশ্বরচন্দ্রের আবির্ভাবের প্রেক্ষাপট। এঁরা হচ্ছেন ইংরিজিতে যাকে বলে pioneer

তাই। এঁরাই পথ নির্মাণ করে যাচ্ছেন এক আলোর পথযাত্রীর জন্য যাঁর হস্তধৃত দীপশলাকায় উদ্ভাসিত হবে শতশত নারীর জীবন, যাঁর সাহিত্যকর্ম আলোচিত হবে দুশো বছর পরেও, যাঁর প্রতিভার ছোঁয়ায় বঙ্গভাষা সমস্ত আড়ষ্টতা ভেঙে সৌন্দর্যমণ্ডিত হবে এবং সেই ভাষা অপেক্ষায় থাকবে আরেক বহু পরিচিতি সমন্বিত অনন্য প্রতিভাশালী ব্যক্তিত্বের জন্য যিনি বাংলাভাষাকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করে তাকে বহন করে নিয়ে যাবেন বিশ্বের দরবারে। তিনি রবীন্দ্রনাথ।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্ম ১৮২০ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর। এই বছর দুশো বৎসর পূর্ণ করলেন তিনি। তাঁর জীবদ্দশায় নানা খাতে প্রবাহিত হয়েছে তাঁর অনন্য সাধারণ প্রতিভা। তিনি ছিলেন কর্মী পুরুষ। সারা জীবনটাই তিনি ছিলেন লড়াকু। সেই লড়াই তাঁর জারি ছিল সমাজের অন্ধ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে। রাজা রামমোহন রায় সতীদাহ প্রথা রদ করে পরবর্তী লড়াই এর ব্যাটনটি সমর্পন করে যান তাঁর পৌরুষদীপ্ত হস্তে। সসম্মানে সেটি গ্রহণ করে বিদ্যাসাগরের দৌড় শুরু হয় বিধবা বিবাহ চালু করার উপায় অন্বেষণে।

ছোটবেলা থেকেই বিদ্যাসাগর বালবিধবাদের দুঃখে বিচলিত। বীরসিংহ গ্রামে বিদ্যাসাগরের খুব বন্ধুত্ব ছিল তাঁর এক খুদে প্রতিবেশী কন্যার সঙ্গে। বালক ঈশ্বরচন্দ্র কলকাতায় পড়তে আসার পর বালিকাটির বিবাহ হয় এবং বিবাহের কয়েক মাসের মধ্যে তার বৈধব্য ঘটে। গরমের ছুটিতে বাড়ি ফিরে বন্ধুর বাড়ি গিয়ে শোনেন ঐ এককোঁটা মেয়ে সারাদিন কিছুই খায়নি, জলটুকুও নয়। কারণ সেদিন একাদশী। বিধবাদের নির্জলা উপবাসের কঠোর অনুশাসনের দিন। বালকের দুচোখ দিয়ে অঝোরধারায় জল নামল। তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন–যদি বেঁচে থাকি এদের জন্য যা পারি করবো। বিদ্যাসাগর মশাই তখন তেরো, চোদ্দ বছরের বালক। বিদ্যাসাগর পরবর্তী কালে নিজমুখে এই ঘটনাটি বলে গেছেন তাঁর গ্রামের আর এক ভালবাসার মানুষ শশিভূষণ সিংহকে। জননী ভগবতী দেবীও সবসময় তাঁকে বলতেন এই দুঃখিনী মেয়েদের জন্য কিছু করতে।

তারপর দিনের পর দিন ভেবেছেন বিদ্যাসাগর। পুথিঁর পাতায় পাতায় খুঁজেছেন অক্লান্তভাবে যদি কিছু সমাধান সূত্র বেরোয়। তাঁর সামনে যে পাথরের দেওয়াল সম দাঁড়িয়ে তৎকালীন গোঁড়া, রক্ষনশীল হিন্দুসমাজ। সেটা তো ভাঙতেই হবে। অসীম বুদ্ধিধর মানুষটি জানতেন শাস্ত্রকে খণ্ডন করতে হবে শাস্ত্র নামক শস্ত্র দিয়েই। এই প্রসঙ্গে শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন, “তিনি রাত্রে ঘুমাইতে পারিতেননা। তিনি দিন দিন এই চিন্তায় এতদূর নিমগ্ন হইলেন যে, আহার নিদ্রা ভুলিয়া গেলেন। সে সময়ে তাঁহার পরিশ্রম যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহাদের মুখে শুনিতে পাই যে, তিনি সংস্কৃত কালেজের পুস্তকালয়েতে বাসা করিয়া ফেলিয়াছিলেন। কি প্রাতে, কি মধ্যাহ্নে,কি রাত্রে যখন যাও, দেখিবে বিদ্যাসাগর মহাশয় পুস্তকরাশির মধ্যে নিমগ্ন”। ১৮৫৩ সালের এক রাত্রিকালে বিদ্যাসাগর এক পুঁথির পাতা উল্টোচ্ছিলেন। পুঁথিটির নাম পরাশর সংহিতা। হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি আটকে গেল একটি শ্লোকে।

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ

পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধিয়তে৷

যদি স্বামী নষ্ট হন, মৃত হন, সংসার ত্যাগ করেন, শারীরিক কোনো ত্রুটি থাকে বা সমাজচ্যুত হন তবে নারীর পুর্নবিবাহে শাস্ত্রাধিকার আছে৷ আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়লেন বিদ্যাসাগর৷ সেখানে তখন উপস্থিত ছিলেন তাঁর বন্ধু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়৷ তিনি পরে বিবৃত করেন ঘটনাটি৷

১৮৫৬ সালের ২৬শে জুলাই বিধবা বিবাহ আইন পাস হয়ে গেল৷ লর্ড ক্যানিং তখন ব্রিটিশ ভারতের গভর্নর জেনারেল৷

প্রথম বিধবা বিবাহ অনুষ্ঠিত হলো ১৮৫৬ সালের ৭ই ডিসেম্বর৷ স্থান বিদ্যাসাগরের বন্ধু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি বারো নম্বর সুকিয়া স্ট্রীট৷ পাত্র ও পাত্রী যথাক্রমে শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ও কালীমতী দেবী৷ বিদ্যাসাগরের একমাত্র পুত্র নারায়ণ চন্দ্রও বিবাহ করেন এক বিধবাকে বলাবাহুল্য পিতার পূর্ণ সম্মতিক্রমে৷ বিধবা বিবাহের স্বপক্ষে সওয়াল করার জন্য কম শারীরিক বা মানসিক লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়নি তাঁকে৷ কিন্ত সমস্ত বাধার সম্মুখে পর্বত সদৃশ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিলেন ঐ ছোটোখাটো মানুষটি৷ উদ্বিগ্ন পিতাঠাকুর ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বীরসিংহ গ্রাম থেকে শ্রীমন্ত নামে এক জেলে সর্দার কে কলকাতা পাঠালেন পুত্রের নিরাপত্তা রক্ষার্থে৷ বাল্যবিবাহ রোধ ও কৌলীন্যপ্রথা রদের জন্যেও ঈশ্বরচন্দ্র যথেষ্ট সক্রিয় ছিলেন৷

বিদ্যাসাগর মনে করতেন তাঁর জীবনের সর্বপ্রধান সৎকর্ম বিধবা বিবাহ প্রবর্তন৷ কিন্ত তাঁর আরো সৎকর্ম রয়েছে যে জন্য মানবজাতি তাঁকে চিরকাল মনে রাখবে৷ সেগুলি হলো তাঁর শিক্ষাবিস্তারের কাজ, সাহিত্যকর্ম, নানাবিধ সংস্কারমূলক কাজ এবং সর্বোপরি দানশীলতা ও পরোপকার প্রবৃত্তি৷ ১৮৯১ সালের ২৪শে অগাস্ট তাঁর মৃত্যুর মাসাধিক কাল পর Indian Nation কাগজ লিখেছিলঃ “Vidyasagar will be remembered for his charity, his educational work, his literary work and his reforming spirit, than for the single legislative measure he succeeded in getting passed.”

যথার্থই বহু পরিচিতির মানুষ ছিলেন তিনি৷

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ও উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে এদেশে প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যাচর্চার অধিকার একমাত্র পুরুষদের ছিল৷ কিছু কিছু লেখাপড়ার চর্চা চালিয়ে যেতেন বৈষ্ণবীরা৷ অবশ্য কতিপয় অভিজাত পরিবারে যেমন পোস্তার রাজবাড়ির, জোড়াসাঁকো-পাথুরিয়াঘাটার পরিবারের মেয়েরা লেখাপড়া শিখতেন৷ বাইরে থেকে শিক্ষয়িত্রীরা এসে তাঁদের পড়াতেন৷ ‘আলালের ঘরের দুলাল’ বইটির লেখক টেকচাঁদ ঠাকুর যাঁর আসল নাম ছিল প্যারিচাঁদ মিত্র লিখে গেছেন তখন

বালিকা বিদ্যালয় না থাকা সত্ত্বেও তাঁর মা, ঠাকুমা, পিসীমারা লিখতে, পড়তে ও হিসেব রাখতে জানতেন। তিনি ছোটবেলায় তা প্রত্যক্ষ করেছেন। প্যারিচাঁদের জন্ম ১৮১৪ সালে। কিন্ত সে তো এলিট সমাজের গল্প। অধিকাংশ মেয়েরাই ছিল অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত। আর স্বল্পসংখ্যক অপ্রতিরোধ্য কিছু মানবী বিদ্যাচর্চা জারি রাখতেন অন্ধকার হেঁশেলের ধোঁয়ায় বসে। রান্নার সরঞ্জামের তলায় লুকোনো থাকত পুঁথি। তার কারণ পিতৃতান্ত্রিক সমাজের স্পর্ধিত চোখ-রাঙানি- মেয়েরা লিখতে পড়তে শিখলে তা ডেকে আনবে পরিবারের তথা সমাজের ঘোর অমঙ্গল। মূল কথাটি হলো শিক্ষা আনে চেতনা, আনে যুক্তিগ্রাহ্য চিন্তার ক্ষমতা। তৎকালীন পুরুষশাসিত সমাজ চাইত নারীদের চেতনাহীন জড় পদার্থ বানিয়ে রাখতে। রবীন্দ্রনাথ যাঁকে ক্ষুদ্র বনজঙ্গলের মধ্যে থাকা বৃহৎ বনস্পতির সঙ্গে তুলনা করেছিলেন সেই মানুষটি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন সমাজের তখনই মঙ্গল হবে, প্রতিটি পরিবার তখনই পাবে কল্যাণের দক্ষিণ হস্তের স্পর্শ যখন নারীসমাজ হবে শিক্ষার আলোয় উদ্ভাসিত। তিনি শুধু সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপালই ছিলেন না বা ছিলেন না শিক্ষা দপ্তরের একজন বড় সচিব বা মেট্রোপলিটান কলেজের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর আসল পরিচয় তিনি একজন শিক্ষাপ্রেমী। সমাজের সকলস্তরে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে বিদ্যাসাগর ১৮৫৭ সাল থেকে ১৮৫৮ সালের মধ্যে হুগলী, বর্ধমান, মেদিনীপুর ও নদীয়ায় পঁয়ত্রিশটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করলেন। গোটা দেশে তখন সিপাহী বিদ্রোহের রণদামামা বাজছে। গভর্নমেন্ট কোনো সাহায্য মঞ্জুর করলো না বিদ্যালয়গুলি চালানোর জন্য। কিন্ত বিদ্যাসাগর নিরস্ত হলেননা। এই বিদ্যালয়গুলি চালানোর জন্য তিনি তৈরী করলেন নারীশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভাণ্ডার। তাতে নিয়মিত চাঁদা দিতে লাগলেন কতিপয় শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি। এছাড়া বিদ্যাসাগরের বেতনের সিংহভাগ খরচ হতো এই স্কুলগুলি বাঁচিয়ে রাখার জন্য। পরবর্তীকালে অবশ্য কিছু সরকারী সাহায্য মঞ্জুর হয়েছিল। অবশ্য একথা অনস্বীকার্য অবৈতনিক বালিকা বিদ্যালয় খুলে এদেশে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের কাজে প্রথম এগিয়ে আসে 'ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি'। এই সোসাইটি প্রথম বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করে ১৮১৯ সালে কলকাতার গৌরীবাড়িতে। এরপর ১৮৪৯ সালে আরেক শিক্ষানুরাগী জন ড্রিংক ওয়াটার বেথুন প্রতিষ্ঠা করলেন হিন্দু ফিমেল স্কুল পরবর্তীকালে যার নাম হয় বেথুন স্কুল। ১৮৫৬ সালে বিদ্যাসাগর এই বিদ্যালয়ের সেক্রেটারী পদে অধিষ্ঠিত হন।

আজ একবিংশ শতাব্দীর বিশটি বছর পার করার পর দেখা যাচ্ছে সর্বধরণের কর্মযজ্ঞে মেয়েরা আজ সামিল। হেঁশেল থেকে মহাকাশ সর্বত্র তাদের অনায়াস গমন। আজকের এই ভয়ঙ্কর কোভিড অতিমারী মোকাবিলাতেও প্রথম সারির যোদ্ধা হিসেবে তারা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করছে অন্যান্য পুরুষ সহযোদ্ধাদের সঙ্গে। এই অর্ধেক আকাশ জয়ের প্রথম পদক্ষেপ কিন্ত অনেককাল আগে গড়ে দিয়েছিলেন বীরসিংহ গ্রামের ঐ একরোখা মানুষটি।

চলমানতাই ভাষাকে দেয় পূর্ণতা। গ্রহীষ্ণুতা ভাষাকে করে তোলে সজীব।বিদ্যাসাগর সেই সজীবতা, পূর্ণতা প্রদান করলেন বঙ্গভাষাকে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাংলার সাহিত্যভাষার সিংহদ্বার উদঘাটন করেছিলেন। তার পূর্ব থেকেই এই তীর্থাভিমুখে পথখননের জন্য বাঙালির মনে আহ্বান এসেছিল এবং তৎকালীন অনেকেই নানা দিক থেকে সে আহ্বান স্বীকার করে নিয়েছিলেন। তাঁদের অসম্পূর্ণ চেষ্টা বিদ্যাসাগরের সাধনায় পূর্ণতার রূপ ধরেছে।"

ঈশ্বরচন্দ্রের আগে যাঁরা বাংলা গদ্যের চর্চা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার,রাজা রামমোহন রায় প্রমুখ। ভাষাবিদদের মতে তাঁদের গদ্য ছন্দে যেটা অনুভূত হয় তা হলো যতি স্থাপনের অভাব। কিন্ত ভাষার প্রাণ যতি স্থাপনের বৈচিত্রে, তা গদ্যই হোক কি পদ্য। প্রমথনাথ বিশী লিখেছেন, "বিদ্যাসাগরের পূর্ববর্তী গদ্যলেখকগণ সজ্ঞানে যতি স্থাপনের নিয়ম অনুসরণ করেন নাই- আঁচে আন্দাজে বা অন্যভাবে চলিয়াছেন, কখনো কখনো তীর লক্ষ্যভেদ করিয়াছে, অধিকাংশ সময়ই করে নাই। বিদ্যাসাগর প্রথম সজ্ঞানে শিল্পবুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া নিয়মটিকে অনুসরণ করিয়াছেন, তাই তাঁহার পক্ষে কমা, সেমিকোলন প্রভৃতির ব্যবহার অপরিহার্য ছিল। কেবল পূর্ণচ্ছেদে তিনি সন্তুষ্ট হন নাই।"

বিদ্যাসাগর মূলত লেখনী ধারণ করেন শিশুপাঠ্য পুস্তকের অভাব পূরণের উদ্দেশ্যে। কিন্ত তাঁর কলম তাঁর practical উদ্দেশ্যকে অতিক্রম করে বাংলা গদ্যের স্থায়ী নির্ভরযোগ্য একটি বনেদ গড়ে তুলল। তাঁর রচিত কথামালা, বোধোদয়, আখ্যানমঞ্জরী শিশুপাঠের তকমা ছাড়িয়ে ক্লাসিকের মর্যাদা পাচ্ছে এখন।

বর্ণপরিচয় প্রথম ও দ্বিতীয়ভাগ বিদ্যাসাগর মশাই লেখেন ১৮৫৫ সালে। এই বইটির মধ্য দিয়ে তিনি শিশুদের শুধু অক্ষরজ্ঞান ও বানান প্রকরণই শেখাননি। তাদের গল্প শোনার কানও তৈরী করে দিয়েছিলেন। ভাল সাহিত্য আমাদের কল্পনা করতে শেখায়। গোপাল, রাখাল যাদব প্রভৃতি বালকের দলের গল্প বলে শিশুর কল্পনার দৃষ্টিকে উন্মোচিত করলেন বিদ্যাসাগর। কত সহজসুরে অত্যন্ত চেনা জিনিষের কথা বলে বর্ণপরিচয় প্রথমভাগে শিশুদের অক্ষর চিনিয়েছেন তিনি। 'অ' চেনাতে গিয়ে বলেছেন অজগরের কথা। 'আ' দিয়ে চেনালেন আনারস। 'ক' বলতে ভেসে এল কোকিলের মধুর তান। আর 'খ'তে দৌড়ে এল খরগোশ। শিশুর অক্ষর চেনার সঙ্গে জড়িয়ে গেল তার কৌতূহল আর আনন্দ যা যেকোনো পাঠের প্রাণ। এরপরের পাঠে শিশু শিখল বড়গাছ, লালফুল, জল পড়ে, মেঘ ডাকে, গরু চরিতেছে, পাখী উড়িতেছে, ফল ফলিতেছে। সে হয়ে উঠল তার প্রতিবেশ ও পরিবেশের সঙ্গে পরিচিত।

বর্ণপরিচয় দ্বিতীয়ভাগে এল যুক্তাক্ষরের সমাহার- ঐক্য,বাক্য,মাণিক্য। বর্ণ শেখা হয়ে গেলে বিদ্যাসাগর মশাই এবার বাচ্চাদের দিতে লাগলেন মনুষ্যত্বের পাঠ। পরিশ্রম না করা অন্যায়, মিথ্যা

কথা বলা অনুচিত, কদাচ চুরি করা উচিৎ নয়। এই বোধগুলি তিনি জাগ্রত করতে চাইলেন শিশুমনে। এই বোধের পরিনতি পাওয়া গেল বর্ণপরিচয় দ্বিতীয়ভাগের শেষদিকে ভুবন ও তার মাসীকে নিয়ে গল্পে। চুরি করা থেকে ভুবনকে বিরত না করে ভুবনকে ভুল শিক্ষা দিয়েছিলেন ভুবনের মাসী। ভুবনকে সেইজন্য শাস্তি পেতে হলো। ভুবনও শাস্তি দিল মাসীকে তাঁর কান কামড়ে দিয়ে। শিশুমন সচেতন বিদ্যাসাগর বুঝেছিলেন এই আখ্যানটি শিশুমনে গভীর রেখাপাত করবে। এখানেই বিদ্যাসাগরের অনন্যতা, বর্নপরিচয়ের অনন্যতা।

বিদ্যাসাগর বাংলাভাষায় সংস্কৃত ব্যাকরণের বই লিখলেন ব্যাকরণ কৌমুদী। আরো লিখলেন সীতার বনবাস, শকুন্তলা, বেতাল পঞ্চবিংশতি, জীবনচরিতের মতো কালোত্তীর্ণ রচনা। শেক্সপীয়ারের নাটক কমেডি অফ্ এরর্স এর পুরো দেশজ রূপ দিলেন তিনি। **নাম রাখলেন ভ্রান্তিবিলাস।** অনুবাদে স্বাধীনতা নেওয়ার পক্ষে ছিলেন বিদ্যাসাগর। আক্ষরিক অনুবাদ মন স্পর্শ করেনা।

বিদ্যাসাগরের অতুলনীয় গদ্যকীর্তির নমুনা পাই তাঁর সীতার বনবাস রচনায়। “লক্ষণ বলিলেন, আর্যে! এই সেই জনস্থান মধ্যবর্তী প্রস্রবন গিরি। এই গিরির শিখরদেশ সততসঞ্চারমান জলধরমণ্ডলীর যোগে নিরন্তর নিবিড় নিলীমায় অলংকৃত। অধিত্যকা প্রদেশ ঘনসন্নিবিষ্ট বিবিধ বনপাদসমূহে আচ্ছন্ন থাকাতে সতত স্নিগ্ধ, শীতল ও রমনীয়, পাদদেশে প্রসন্ন সলিলা গোদাবরী তরঙ্গ বিস্তার করিয়া প্রবলবেগে গমন করিতেছে।”

পড়ার পরে অনেকক্ষণ ধরে যেন মনের মধ্যে ঝংকৃত হয়, অনুরণিত হয় ভাষার দ্রিমিদ্রিমি রব।

সংস্কৃতে একটি কথা আছে- গুণীঃ গুণং বেত্তি। ন বেত্তি নির্গুণঃ। গুণীই একমাত্র পারেন প্রকৃত গুণীর কদর করতে। বাংলাভাষার পরম সাধক রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরের গদ্যরীতি নিয়ে যা বলেছেন তার তুল্য বুঝিবা আর কিছুই হয়না। “বিদ্যাসাগর বাংলাভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন। তৎপূর্বে বাংলা গদ্যসাহিত্যের সূচনা হইয়াছিল, কিন্ত তিনিই সর্বপ্রথম বাংলা গদ্যে কলানৈপুণ্যের অবতারণা করেন।.....তিনি দেখাইয়া ছিলেন যে যতটুকু বক্তব্য তাহা সরল করিয়া, সুন্দর করিয়া এবং সুশৃংখল করিয়া ব্যক্ত করিতে হইবে..... সৈন্যদের দ্বারা যুদ্ধ সম্ভব, কেবলমাত্র জনতার দ্বারা নহে, জনতা নিজেকেই নিজে খণ্ডিত, প্রতিহত করিতে থাকে, তাহাকে চালনা করাই কঠিন। বিদ্যাসাগর বাংলাভাষার উচ্ছৃঙখল জনতাকে সুবিভক্ত, সুবিন্যস্ত, সুপরিচ্ছন্ন এবং সুসংযত করিয়া তাহাকে সহজ গতি ও কর্মকুশলতা দান করিয়াছেন। এখন তাহার অনেক সেনাপতি ভাবপ্রকাশের কঠিন বাধাসকল প্রতিহত করিয়া সাহিত্যের নবনব ক্ষেত্র আবিষ্কার ও অধিকার করিয়া লইতে পারেন। কিন্ত যিনি এই সেনানীর রচনাকর্তা যুদ্ধজয়ের যশোভাগ সর্বপ্রথমে তাঁহাকেই দিতে হয়।”

বিদ্যাসাগরের পরোপকার,দানশীলতা, দয়াধর্ম একটি মিথের পর্যায়ে চলে গেছে। ওঁর কাছে সাহায্য প্রাপকদের নাম সম্বলিত একটি লম্বা তালিকা ছিল। প্রতিমাসের প্রথমে অর্থ পৌঁছে যেত প্রাপকদের

কাছে। বিদ্যাসাগর জীবনের শেষপর্যায়ে অনেকটা সময় কাটাতেন কারমার্টঁড়ে। সেখানকার সাঁওতালদের সঙ্গে ভারী ভাব হয়ে গেল তাঁর। বড্ড গরীব ওরা। যখন ওখানে যেতেন হাত ভরে জিনিষ নিয়ে যেতেন ওদের জন্য। কাপড়-চোপড়, ওষুধ-বিষুধ, চাল-ডাল, থালা-বাটি সব। কারোর অসুখ করলো তো হোমিওপ্যাথির বাক্স নিয়ে ছুটলেন তার বাড়ি। যখনি পয়সার দরকার হতো সাঁওতালেরা ভুট্টা বেচতে আসত তাঁর কাছে। বিদ্যাসাগরের তাক ভরে উঠলো ভুট্টায়। আবার খাবার না থাকলে আবদার জুড়তো তাঁর কাছে, 'বিদ্যেসাগর, খেতে দে।' এতটাই আপন মনে করতো তাঁকে। দেখতে দেখতে বাড়ির সামনের উঠোন ভরে উঠতো সাঁওতালে। বিদ্যাসাগর তাক খালি করে ভুট্টা দিচ্ছেন আর ওরা কাঠকুটো জ্বালিয়ে মহানন্দে ভুট্টা সেঁকে খাচ্ছে। খাওয়া শেষ হলে একগাল হেসে বলছে , 'খুব খাইয়েছিস, বিদ্যেসাগর।' ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করেছেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। সাধে কি আর মাইকেল মধুসূদন দত্ত বলেছেন- He has the genius and wisdom of an ancient sage, energy of an Englishman and the heart of a Bengali mother.

প্যারিসে স্ত্রী পুত্রকন্যা নিয়ে থাকাকালীন চরম দুর্দশাগ্রস্ত মাইকেল মধুসূদন দত্তকে বিদ্যাসাগরের অর্থসাহায্য প্রেরণের গল্প তো ভুবনবিদিত। নিজের কাছে অত টাকা ছিলনা। ধার করে টাকা পাঠালেন মাইকেলকে। যতদিন বেঁচে ছিলেন মধুসূদন অদ্ভুত এক শ্রদ্ধাপূর্ণ ভালবাসায় জড়িয়ে ছিলেন বিদ্যাসাগরের সঙ্গে। প্যারিসের এক দোকানে মধুসূদনের চোখে পড়ল বিদ্যাসাগরের বই। আনন্দে উদ্বেল মধুকবি। তাঁর উচ্ছ্বাস দেখে দোকানির প্রশ্ন- উনি কি বেঁচে নেই? মাইকেলের দৃপ্ত উত্তর - "God forbid, said I - His country and friends cannot spare him." বিদ্যাসাগরকে চিঠিতে জানালেন একথা। তখন ১৮৬৪ সাল। তারপর যুগপৎ গঙ্গা আর প্যারিসের সিন নদী দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে। কিন্ত এখনো কি আমাদের দেশ বিদ্যাসাগরকে spare করতে পারে?

যুক্তিবাদী, বিজ্ঞানমনস্ক, মানবতাবাদী, করুণাসাগর বিদ্যাসাগরের দ্বিশত বর্ষ সর্ম্পূণতার মহালগ্নে মনে আসছে রবীন্দ্রনাথের 'চারিত্রপূজার' অর্ন্তগত 'বিদ্যাসাগর চরিত' রচনাটির কথা। কি অমোঘ বাণী উৎসারিত হয়েছিল কবির লেখনী দিয়ে–

"মাঝে মাঝে বিধাতার নিয়মের এরূপ আশ্চর্য ব্যতিক্রম হয় কেন, বিশ্বকর্মা যেখানে চারকোটি বাঙালি নির্মাণ করিতেছিলেন সেখানে দু একজন মানুষ গড়িয়া বসেন কেন, তাহা বলা কঠিন। কি নিয়মে বড়োলোকের অভ্যুত্থান হয় তাহা সকল দেশেই রহস্যময়- আমাদের এই ক্ষুদ্রকর্মা ভীরু হৃদয়ের দেশে সে রহস্য দ্বিগুণতর দুর্ভেদ্য। বিদ্যাসাগরের চরিত্র সৃষ্টিও রহস্যাবৃত। কিন্ত ইহা দেখা যায় সে চরিত্রের ছাঁচ ছিল ভালো।"

আমরা অতি ক্ষুদ্র মাপের মানুষ। এই হিমালয় সদৃশ মানুষটির দিকে অনেকটা নিম্নভূমি থেকে ঘাড় উঁচু করে তাকিয়ে এই বলে শ্রদ্ধা নিবেদন করি যা ব্রিটিশ কবি ম্যাথু আর্নল্ড তাঁর Shakespeare কবিতায় মহাকবি শেক্সপিয়ার কে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন–

Others abide our question. Thou art free.

We ask and ask - Thou smilest and art still,

Out-topping knowledge. For the loftiest hill,

Who to the stars uncrowns his majesty.

তথ্যসূত্র: জীবনচরিত–ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর

বিদ্যাসাগর রচনাসম্ভার- ভূমিকা -প্রমথনাথ বিশী

করুণা সাগর বিদ্যাসাগর–ইন্দ্রমিত্র

বিদ্যাসাগর ও বর্ণপরিচয়–রবিবারের পাতা, গণশক্তি

যখন বৃষ্টি আসে

অনিন্দ্য গাঙ্গুলী

যতই ডাকুক কাশের ক্ষেত
ধোঁয়া ওঠা সেই রেলের গাড়ি
অপু কিছুতেই যাবে না আর
ওদের সাথে অপুর আড়ি

বৃষ্টিরা ঠিক আসেই আসে
সব কিছু যেন কেড়ে নিয়ে যায়
মনে করে তাই ছাতা নেয় অপু

-একলাই এখন চুল আঁচড়ায়

দিদিরা কখনো চুরি করে না
পেয়ারা কিম্বা তেঁতুল আচার
সবার আড়ালে লুকিয়ে ঠিক
ফেলে দেবে অপু পুঁতির হার

কার-ই বা পুতুল করবে চুরি
কার উপরে সে খাটাবে জোর
কি করে এখন সাজবে অপু
কি করে হবে রাজপুত্তুর

সবাই কেমন ছেড়ে চলে যায়
দুঃখ কেন যায় না দূর
শুধু আমাদের ছোট্ট অপু
ছেড়ে চলে যায় নিশ্চিন্দিপুর।

এখনকার যত যা তা গল্প

আদিত্য চক্রবর্তী

আজ একেবারে সব সত্যি কথা বলছি এবং বলবো। দেখে নেবেন ঠিক বলছি কিনা মিলিয়ে! অবশ্য মেলাবেন কোথা থেকে - আর সবাই বাকিরা তো সত্যি কথা বলছে না। অবশ্য অঘটন তো আজও ঘটে তাই হলফ্ করে কিছু বলতে পারব না আর বলবও না। আমাদের পুজোর নাটকে ভুল করে একজন তো বলেই ফেলেছিল "পাপের জয় আর পুণ্যের পরাজয়"। যাইহোক, আমার সেই সত্যের কড়চা না হয় এবার খুলেই বসি। আশাকরি আপনাদের কোনও আপত্তি নেই তাতে। পলাশীর সেই রক্তাক্ত যুদ্ধের ব্যাপার যেরকম আমরা সবাই জানতে পেরেছি যুদ্ধ মিটে যাওয়ার পর। আর আমার এইসব সত্যি আখ্যান আপনারাতো লেখা হয়ে যাবার পরেই পড়ার সুযোগ পাবেন। সুতরাং আমার কোনো চিন্তা নেই। আপনাদের কিছুই করারও থাকবেনা তখন। না,না অনেক দেরি হয়ে যাচ্ছে এবার! সত্যি সত্যিই শুরু করছি আমার সেইসব সত্যি গল্পের ব্যাখ্যান। আপনারা তো নিশ্চয়ই শুনেছেন হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাপ্লিকেশন এর নাম। খুবই মজার জিনিষ এটা! বিনা পয়সায় ফোন করা যায়, ভিডিও করা যায় আর চ্যাটও করা যায়। আর তা ছাড়া আরোও কতো কিছু করা যায়।

মানে একেবারেই বিনা পয়সায় গাঁটের এক পয়সা না খসিয়েই কথা বলুন। সুতরাং দেশে মানে ভারতে ফোন করতে, প্রিয়জনদের সঙ্গে কথা বলতে আর কোনোও বাধা নেই। যখন তখন, যেখানে সেখানে, পাটনা থেকে পাটলিপুত্র, কলকাতা থেকে কালিকট, ভূপাল থেকে মহিপাল। অবশ্য মহিপাল বলে কোন জায়গা থাকলে তবেই অবশ্য। কোন ঠিক-ঠিকানা নেই, যখন-তখন, যেখানে সেখানে, যেকোনোও সময় কল করি। কলকাতায় কল করলে অবশ্যই সময়ের জ্ঞান থাকতে হবে। সকাল বিকেল এর পার্থক্য তো আছেই। আর যাকে কল করছেন সে তখন কি করতে পারে তার জ্ঞান থাকাও খুবই জরুরী। এবারে এসবের আর নাইবা বিস্তার করলাম। এখন হোয়াটসঅ্যাপ কল করে জানতে পেরেছি যে কলকাতার টেলিভিশনে সব সময় নাকি একটার পর একটা বাংলা সিরিয়ালস্ হয়ে যায়। তার আদি নেই, অন্ত নেই। অবশ্যই কলকাতার সবাই সবকিছুই দেখে। কোনটাই নাকি ছাড়া যাবেনা। কোনটায় কোর্ট সিন হচ্ছে, আর কোনোওটাতে গোয়েন্দা খুনিকে প্রায় ধরে ফেলেছে। কিন্তু না, খুনি ধরা দেবেনা কোনদিনও, আর কোর্ট সিন এর নিষ্পত্তিও হবে না। কেননা বাংলা সিরিয়াল তো চলতেই থাকবে যুগযুগান্তর ধরে! তার আদি নেই, অন্ত নেই। একেবারে আত্মার মত। ইহাকে খন্ডিত করিতে পারিবে না, কাটিতে পারিবেনার মতন ব্যাপার। মানে খুবই সাংঘাতিক এবং মর্মান্তিক তো বটেই।

আগেই তো বলেছি যখন তখন whatsapp-এ ফোন করি এবং ফোন ধরি। মাঝে মাঝে তো মনে হয় এই হোয়াটসঅ্যাপই আমার জীবন, এই করোনাভাইরাস এর দৌলতে বাড়িতে বসে থেকে।

আর যখনই দেশে ফোন করি তখনই জানতে পারি এখন সময়টা ঠিক নয়, কোনও এক বাংলা সিরিয়াল চলছে নাকি তখন। খুবই নাকি ইন্টারেস্টিং। মানে ফোনে কথা বলা যাবে না ওই সময়ে। আগে যখন গাঁটের পয়সা দিয়ে ফোন করতে হত তখন দেশের লোক খাদ লাফিয়ে, গঙ্গা পেরিয়ে, হিমালয় ঝাঁপিয়ে সেই ফোন ধরার জন্য আকুলি-বিকুলি করে চলে আসতো। আর এখন সবই আমার কপাল। সত্যই সময় খারাপ, খুবই গুরুতর। এই তো সেদিন খুবই আশা করে, দিনক্ষণ দেখে, সময় মিলিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করলাম। আমার শ্যালিকা ধরল সেই ফোন আর বলে উঠল, এখানে আকাশ নীল। আমি একটু হতবাক্ হয়ে বলি তো তাতে কি হয়েছে। এখানেও তো আকাশ নীল! মাঝে মধ্যে অবশ্যই কালো অথবা লাল টুকটুকে হয়ে যায়। শ্যালিকা হেসে গড়িয়ে গেল। আরে "এখানে আকাশ নীল" তো একটা বাংলা সিরিয়াল। তারপরেই বলে আচ্ছা "প্রথমা কাদম্বিনী" দেখেছো? আমি যাকে বলে হতচকিত্। না, না ওই সিরিয়ালটা মিস করেছি, কবে দ্বিতীয়া কাদম্বিনী, তৃতীয়া কাদম্বিনী হবে জানিও! ঠিক বলছি নিশ্চয়ই দেখব। তাও শ্যালিকাকে শুধোলাম, এই প্রথমা কাদম্বিনী, দ্বিতীয়া কাদম্বিনী, তৃতীয়া কাদম্বিনী ইত্যাদি ইত্যাদি কি হিন্দি সিনেমার Don 1, Don 2 আর Don 3 র মতো নাকি? কোন উত্তর পেলাম না অপরপ্রান্ত থেকে। কেবল একটা ব্যঙ্গ হাসি শুনলাম। আর এক দিনের ঘটনা। সেই whatsapp- এ ফোন করেছি। যথারীতি শ্যালিকা ধরল। প্রথমে কিছুই বলে না। একেবারে মৌনব্রত ধরেছে। তারপর কিছুক্ষণ থেমে বলে, কি করে বলবো তোমায়। তার মানে, তার মানে? আমি বেশ ঘাবড়ে গেলাম। এ আবার কি গন্ডগোল রে বাবা! কি এমন কথা যে বলা যাবে না। মনের কিছু গুপ্ত কথা নয় তো? আমি ভাবতে লাগলাম। তখন আমার শ্যালিকা আবার বলে উঠল, জানিনা বলব কিনা। কে আপন আর কে পর। আমি খুবই প্রতিবাদ করলাম। না, না আমি তো খুবই আপন জন, নিজের কাছের লোক। কিন্তু ততক্ষণে হোয়াটসঅ্যাপ ডিসকানেক্ট করে দিয়েছে আমার শ্যালিকা। আপনাদের তো আগেই বলেছি যে বাংলা সিরিয়াল এর দৌলতে ফোন করাই দায় হয়েছে। কখনো "এখানে আকাশ নীল", তারপরেই "কে আপন কে পর", "কি করে বলবো তোমায়", "প্রথমা কাদম্বিনী" ছাড়াও রয়েছে অসংখ্য অন্য সিরিয়ালস্ যেমন "আলোছায়া", "শ্রীময়ী", "মোহর", "খড়-কুটো", আরোও কত কি। সব কটা জানতে হলে চলন্তিকাই ঘাঁটতে হবে এই বলে দিচ্ছি আমি।

আমি ছোটবেলায় বরাবর খুবই হাসিখুশি ছিলাম। মুখটা হাসি হাসি বলে বড় বয়সেও আমাকে হাসমুখা বলে সবাই জানতো। কিন্তু এখন এই করোনাভাইরাস্ এর দৌলতে সেই হাসি হাসি মুখে আর হাসি নেই। চমক লেগে গেছে মানে - একবারে চমক মুখে পরিণত হয়েছে। তাই হাসমুখা থেকে চমকমুখা হয়ে গেছি। আর এসব কারণেই অন্য সবাইরা এবং আমিও হাসতে ভুলে গেছি। সেই যে ছোটবেলায় শোনা বিখ্যাত ছড়া -

রামগরুড়ের ছানা,

হাসতে তাদের মানা।

হাসির কথা শুনলে বলে,

হাসবো না না না না!

কেউ মুখ খুলে হাসতেই চায় না। কেমন যেন সবাই হাঁড়ি মুখ। আমি তো বরাবরই জানি আমাদের শিরা উপশিরা দিয়ে লাল রক্ত প্রবাহিত হয়। আর সেই সুদূর ইংল্যান্ডের রাজা এবং রাণী্র পরিবারের সদস্যদের শিরা-উপশিরা দিয়ে কিনা নীল রক্ত, তারমানে Blue Blood প্রবাহিত হয়। খুব ভালো কথা। কিন্তু এই সেদিন শুনলাম পাশের এক বিরাট দেশের রাষ্ট্রপতির ধমনী দিয়ে নাকি disinfectant প্রবাহ করছে। সেটা যে কি বস্তু বা তার রঙ্গই বা কি, আমার সেটা জানা নেই। বাঙালি অবশ্য করোনা কে ভয় পায় না। তার কারণ ছোটবেলা থেকেই তো আমরা শুনে আসছি মাসি, পিসি, বাবা, মা, মামা সবার কাছ থেকেই "কোরোনা কোরোনা কোরোনা"। এটা কোরোনা, ওটা কোরোনা, এটা করতে নেই, ওটা করতে নেই। সুতরাং শুনে শুনে অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। করোনার সঙ্গে যুদ্ধ করতে এবং সেটাকে জিততে বাঙ্গালী পিছিয়ে নেই।

সেদিন সকাল বেলায় জগাদার বাড়ি গেছি আড্ডা মারতে। গিয়ে দেখি জগাদা সেজেগুজে বেরোনোর জন্য তৈরি হচ্ছে। কোথায় চললে গো জগাদা হেসে বলে উঠলাম। জগাদা বাড়িতে না থাকলে তো চা-টা ও জুটবে না বুঝতে পেরেছি এতদিনে। জগাদা কিছু বলার আগেই জবাবে জগাবৌদি বলল, ভাই তোমার জগাদা একটু যাচ্ছে করোনা টেস্ট করাতে। দেখলাম তখন কপালে দই চন্দনের ফোটা কিন্তু মুখটা একটু ভয়ভীত জগাদার। জগাদাকে সাহস্ দেওয়ার জন্যই জোর গলায় বললাম, একেবারে রাষ্ট্রভাষা এবং রাণীর ভাষা মিলিয়ে - বিলকুল ঘাবড়াও নেহী জগাদা, be positive.

আর তারপরেই হতচ্ছাড়া, উজবুক, পচা ইঁদূর, দেখাচ্ছি মজা তোকে। বলেই ঝাড়ু হাতে তাড়া করে এল আমার দিকে জগাবৌদি। তোর একদিন কি আমার একদিন বলে হারে রে রে রে করে তাড়া করল আমাকে। সেই থেকেই পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছি। ওবাড়ীর দিকে আর হইনি। আর পরে জেনেছিলাম জগাদা ঠিকই ছিল কোন করোনা টরোনা কিছু হয়নি কেবল টেস্ট করাতে গিয়েছিল।

কথায় বলে কোনও গল্পের শেষ হয় না যতক্ষণ না গল্পের গরু গাছে ওঠে। এটাতো হলো গল্পের ব্যাপার-স্যাপার। আর কোনও মজার গল্পের শেষ হয় না যতক্ষণ না মদ্যপ বা মদ্যপানের জায়গাকে আনা যায় গল্পে। মানে নেশার ব্যাপার। গুরুদেবই তো লিখে গেছেন -

অভয় দাও তো বলি,

আমার wish কী।

একটি ছটাক্ সোডার জলে,

পাকি তিন পোয়া whiskey!

সুতরাং গুরুদেব যদি আনতে পারে মদ, মাতাল তো আমিই বা কেন মদ মাতাল ইত্যাদি এদের আনতে পারব না গল্পে। যাই হোক একটা ছোট্ট গল্প বলি আগে। সারমেয় ঘঠিত কান্ড! একবার একজনের কুকুর রাস্তায় বেরিয়ে হঠাৎই একটা গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা খায়। কুকুরটা তাতে খুবই মনমরা হয়ে পড়ল। তখন কুকুর এর মালিক তাকে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিল, ভাবল একটু পরেই নিশ্চয়ই ঠিক হয়ে যাবে। আর মনমরা হয়ে থাকবে না। কিন্তু অনেকক্ষণ পরেও কুকুরটা মনমরা হয়েই শুয়ে থাকল। লজ্জা হয়েছে শেষে কিনা! সামান্য একটা গাড়ির ধাক্কা খেলো সেইজন্যই! ভদ্রলোক নিজের খোরাক থেকে চামচে করে খাইয়ে দিল দুই আউন্স হুইস্কি। সেকেন্ডের মধ্যেই আবার রাস্তায় ছুটে গেল আরো চাঙ্গা হয়ে কুকুরটা। তাড়া করতে শুরু করল সব গাড়িকেই প্রচন্ড উৎসাহ নিয়ে।

এটা তো হল কুকুরের গল্প। এবার শুনুন মানুষের কাণ্ডকারখানা। মাতালের গল্প এটা। একবার একজন একটা পাবে (Pub) এ খুবই মনমরা হয়ে বসে আছে। মুখে হাসি নেই কোথাও। মায়া হলো আমার দেখে। জিজ্ঞাসা করলাম ভাই কি হয়েছে তোমার, সব ঠিক তো? ও বলল, না বন্ধু, ব্যাপার খুবই সাংঘাতিক। গতকাল রাতে এক বোতল হুইস্কির বিনিময়ে আমার বউকে বেচে দিয়েছি। ও সেই জন্যেই কি আজ তোমার খুবই অনুশোচনা হচ্ছে বন্ধু? না, না ঠিক তা নয়। ভাবছি আজ তো আর বউ নেই, তাহলে আজ হুইস্কি কি বেচে খাব?

আরেক মাতালের কাহিনী। সেও খুব মনমরা হয়ে গম্ভীরমুখে পাবে বসে একটু একটু করে চুমুক দিচ্ছে হুইস্কিতে। মুখে খুবই দুঃখের ছাপ। দেখে খারাপ লাগলো। গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম প্রবলেমটা কি তোমার? বলল আমার বউয়ের সঙ্গে খুব গোলমাল চলছে আর বউ বলেছে আমার সঙ্গে তিরিশ দিন আর কোনও কথাই বলবে না। তো আমি বললাম তাহলে তো তোমার ভালই হয়েছে। তিরিশ দিনের জন্য একেবারে শান্তি বাড়িতে! হ্যাঁ, ভালোই তো ছিল খুবই। কিন্তু, কিন্তু বলতে বলতেই লোকটা কেদেঁ ফেলল আর বলল, আজই সেই তিরিশ দিনের শেষ দিন! কপাল আমার!

উপরের দুটো গল্পই বউকে নিয়ে। সুতরাং আরেক বউ ঘটিত ব্যাপার স্যাপার দিয়েই আজ শেষ করছি। কোথায় যেন পড়েছি বা নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি তা অবশ্যই হলফ করে কিছু বলতে পারছি না এখনি। অর্থাৎ যতক্ষণ না আমার নিজের একমাত্র বউ এই গল্পটা পড়ছে।

তখন কি হবে আমার তা জানা নেই। একবার এক বাবা তার চার বছরের ছেলেকে নিয়ে মাঠে বেড়াতে গেছে। হঠাৎই এই ছেলেটা একটা অদ্ভুত জন্তু দেখতে পেলো মাঠে। বাবা, বাবা, ও বাবা, ওটা কি? বাবা বলল ওটা একটা গাধা। ছেলের কৌতূহল আর মেটে না। আর ওই, ওই গাধাটার পিছনে ওটা কি? ওটা ঐ গাধাটার বউ বলল ওর বাবা! আচ্ছা বাবা, গাধারাও বিয়ে করে তাহলে? বাবা বলল, হ্যাঁ, গাধারাই বিয়ে করে কেবল। জানিনা সেই বাবার সেদিন বাড়ী ফিরে গিয়ে কি পরিণতি হয়েছিল। জানা যায়নি বা জানতে পারিনি আমি।

চেয়ে দেখি

ডক্টর ঝর্ণা চ্যাটার্জী

বহু দূরে মহা শূন্য থেকে
মহা কালসিন্ধু পারে বসে
চেয়ে চেয়ে দেখি এই বিশ্ব চিরন্তন
পলে পলে সূর্য তারা ধূমকেতু
ছুটে চলে ঘন কালো নীল কক্ষপথে
গ্রহ-শিশু খেলে, সারা অংগে আলো মেখে
এরই মাঝে অতি ক্ষুদ্র অপূর্ব গোলক
প্রাণ ভরা, শ্যামল সুন্দর, রৌদ্র উলসিত
সমুদ্র তরঙ্গ সেথা নাচে-গায় অতন্দ্র নিশায়
তিমি মাছ সুর তোলে গহন অতলে

বৃষ্টি ঝরে, বায়ু আনে শ্বাস
তুষারকিরীটী শৃঙ্গ এনে দেয় সুধা-বারি
প্রার্থনার ডাক তোলে মন্দির মসজিদ গীর্জা সবে
ব্যাকুল ভাষায় - একই রবে
আবার মিলায়ে যায় মুহূর্তের খেলা
কে-বা বড়, কে-বা ছোট, ভাল মন্দ কে-বা
কোথা ভুল কোথা ঠিক, অব্যক্ত বেদনা
কার কাছে কত আছে - বুদ্ধি বিত্ত শোভা
নাম যশ রত্ন মণি সোনা - কত অহঙ্কার আর কত অভিমান
সব কিছু ছায়া হয়ে ছায়াপথে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা
মিলায় আবার -
নূতন আসর বসে, নূতন সৃজনে
কলরব কোলাহল নূতন সংগীত
অনন্তের চক্র সভাতলে।

চিরন্তন

ডক্টর ঝর্ণা চ্যাটার্জী

দার্শনিকদের মতে আত্মা নশ্বর নয়

আকার, আকৃতি আর রূপের রূপকথা ছাড়িয়ে

তার অস্তিত্ব চিরকালের, চির-অক্ষয়

মহাভারতে ধ্বংসের মহাক্ষেত্রে এই ছিল পরম সান্ত্বনা
শরীর সত্বার আবরণ মাত্র
নানা সূতোয় বোনা পোষাকের আড়ালে
যে লুকিয়ে আছে তার পরিবর্তন নেই
স্থান আর কালের কাঠামোয় তৈরী
পঞ্চভূতের পৃথিবীটা আসলে কিছুই নয়
দেখছি আর শুনছি যা সে শুধু অজ্ঞান আর মায়া
মায়াবাদের সাথে সমস্বরে বলেছেন
পদার্থবিদ্যার বিশেষ বিজ্ঞানীরা
আমাদের চারিদিকে শুধু অণু-পরমাণুর চঞ্চল লীলা
গভীর চিন্তা আর জটিল অংকে এই উত্তরে
পৌঁছেছেন তাঁরা ।
কিন্তু! এই কিন্তুটাই তো বাধিয়েছে বিপদ
আমার এই মিথ্যা জগতের পরম সত্যি দিনে রাতে
হঠাৎ হাসি, হঠাৎ দেখার পলকে যাকে চিনেছিলাম
সেই ধরাছোঁয়ার রূপের আড়ালে চিরন্তন অরূপ সত্বা
কোন অণু, কোন পরমাণুতে কোথায় তার পরশ পাব?
আমার সন্তানের আনন্দের ক্ষণে
হাসির আলোয় কার চোখে আমি চোখ রাখব?
দুঃখ দুরাশার ঘূর্ণী ঝড়ে দিশাহারা পথে
পরম আশ্বাসে কার হাত ধরে আমি এগিয়ে যাব?
ওগো বিজ্ঞানী, ওগো জ্ঞানী,

হে আমার দয়াময় সগুণ ঈশ্বর,

চোখের জলের সমুদ্রের পারে - বলে দাও

কোন রূপে তাকে চিনতে পারব?

সুরের জালে

রাজশ্রী সেনগুপ্ত (ঝর্ণা চ্যাটার্জীর বোনঝি)

সুখেন দাস ঘরের সামনে খোলা জায়গা টুকুতে বসে তার উচ্চ মাধ্যমিকের পড়াশোনার করে।জায়গাটা খুবই অপরিসর এবং পর পর সারি সারি ঘরের সবার যাতায়াতের পথ।তাতেও সুখেনের কিছু এসে যায়না,তার বদ্ধ ঘরটুকুর চেয়ে এই ভাল।ইস্কুল থেকে ফিরে যতক্ষন আলো থাকে তার সময় এখানেই কাটে।

আজ দুবছর হল তারা এই ঘরে। এক বছর হল মা গত হয়েছেন ।এখন সে এখানে একেবারে একা। গ্রামে দাদারা আছেন চাষ বাস দেখেন। সুখেনের মাথা খুব পরিস্কার , মাধ্যমিকে সে এত ভাল ফল করেছিল যে শুধু তার পরিবার না সারা গ্রামের মুখ উজ্জ্বল হয়ে যায়।মাস্টার মশাইরা খুশি তো বটেই অত্যন্ত গর্বিত ও। দাদারা তাই কষ্ট করে হলেও ওর এখানকার খরচ চালিয়ে যাচ্ছেন।ইস্কুলের ফি লাগেনা দাদারা যা পাঠান তাতে ওর থাকা খাওয়া চলে যায়।
মা চলে যাবার পর পাশের ঘরের কাকিমা যাঁর সাথে রক্তের কোন সম্পর্ক নেই তিনি ওর রান্না খাওয়ার ভার তুলে নিয়েছেন । ও শুধু খরচ টুকু দিয়েই খালাস।এই ভালবাসাটুকু পেয়ে সে ধন্য। কাকিমার মেয়ে রানু দুবেলা তার খাবার গুছিয়ে দিয়ে যায়।ভারী মিষ্টি মেয়ে ।
প্রায়ই ঘরে ফিরে সে দেখে তার অগোছালো ঘর কোনো রমনীয় হাতের ছোঁয়ায় ভোল পালটে ফেলেছে। অনেকবার সে রানুকে বলেছে আমার ঘর তোকে পরিস্কার করতে হবেনা। রানু লজ্জায় মাথা নীচু করে চলে যায়, কোনো উত্তর দেয়না। সুখেন জানে বৃথাই বলা রানু শুনবেনা।মেয়েটি ভারী লাজুক।

সুখেনের আরেকটি গুণ সে ভারী সুন্দর গান গায়। চমৎকার মিষ্টি গলা তার। সে যখন আপন মনে গান গায় আশপাশের লোক দু দন্ড থেমে শুনে যায়।পাড়ার কচিকাঁচা ছেলে মেয়েদের সে বিকেল হলেই গান শেখায়। শিশুদের মিষ্টি গলার সুরে ছোট চাতাল টুকুতে একটি ভারী মনোরম পরিবেশের সৃস্টি হয়। অভিভাবক রা ধন্য হয়ে যান, যার যা ক্ষমতা মত দু চার টাকা পাঠিয়ে দেন। সুখেন ও ধন্য হয়। সযত্নে সেই টাকা সে জমিয়ে রাখে। তার বড় সখ সে একটা

মাউথঅরগান কেনে ।।বাজারে মনিহারি দোকানে সে দেখে এসেছে। দোকানী তার উৎসাহ দেখে হাতে নিয়ে পরখ করতেও দিয়েছেন।আর অল্প কিছু টাকা হলেই তার সাধের মাউথ অরগ্যান সে কিনে আনবে।

একদিন রানু খাবার নামিয়ে রেখে অন্যান্য দিনের মত চলে না গিয়ে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে আছে দেখে সুখেনই প্রশ্ন করে,,"কি রে রানু কিছু বলবি"? নত মাথা তার আরো নত হয়ে যায়, কোন রকমে নীচু গলায় সে বলে,"সুখেনদা আমাকে গান শেখাবে?"
"ও মা, তুই গান জানিস বুঝি? কখনও তো শুনিনি।"
"জানি না, তুমি যদি শেখাও।"
"ওমা বেশ তো বিকেলে আসিস সবার সাথে তোকেও শেখাব।"
"না না সে আমি পারবোনা লজ্জা করে।"
"তবে সন্ধ্যায় এখানে আসিস, শেখাব 'খন।" রানু এক ছুটে ঘর ছেড়ে চলে যায়।

পরদিন সন্ধ্যে হতেই রানুর আবির্ভাব সুখেনের ঘরে।ধীর পায় ঘরে ঢুকে চৌকির একধারে বসে পড়ে ।
সুখেন বলে,"আমি এক কলি গাইব তুই সেই শুনে গাইবি। ঠিক আছে? বলেই সে গান ধরে, "আমি কোথায় পাব তারে আমার মনের মানুষ যেরে", দুবার এই কলিটি গেয়ে সে তাকায় রানুর দিকে, হঠাৎ যে কি হয় ঐ আবীর লাল নতমুখী মেয়েটির মুখে তার দুচোখ আটকে যায় , তার মনে হয় এই অপূর্ব সুন্দর মুখ সে আগে কখনও দেখেনি। সত্যি রানুর দিকে আগে এমন ভাবে সে চেয়ে দেখেছে কি? তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে সেও একটু যেন কাঁপা গলায় বলে ,"কিরে শুরু কর।"

প্রথম দিন লজজায় সংকোচে গলা বুজে এলেও আসতে আসতে সহজ হয়ে যায় রানু।শিক্ষা চলতে থাকে, দুজনেই রানুর মিষ্টি গলা আর সুরের দখল আবিষ্কার করে মুগ্ধ হয়ে যায়। রানু নির্ভুল সুরে পুরো গানটি যেদিন গেয়ে ওঠে , দুজনের সুর মিলে একাকার হয়ে যায়। উত্তেজনায় সুখেন উঠে রানুকে দুহাতে বুকে জড়িয়ে ধরে। হঠাৎ যেন প্রলয় ঘটে যায় , দুজনের হৃদয়ে একই সাথে দিরিম দিরিম তালে শয়ে শয়ে মাদল বেজে ওঠে আর দুজনের বোজা চোখে হাজারো তারাবাতির রোশনাই। কয়েক মুহূর্ত পরে ছাড়া পেয়ে রানু দূরে সরে গেলেও তখনও দুজনের বুকে দুমদুমিয়ে মাদল বেজে চলেছে আর সুখেনের ছোট্ট ঘরটি সুরের ঢেউয়ে পাল তোলা নৌকার মত ভেসে চলেছে।

পথের সারথী

সুভাষ চন্দ্র বিশ্বাস

আকাশে বসেছে চাঁদের হাট।
সে হাট ছাড়িয়ে ছায়াপথ পেরিয়ে
পৌছে যাই সনাতনী অন্ধকারে।
হে আমার পথের সারথী,
তুমি কি জান কোথায় আমার ঘর?

যখন চুপি চুপি রাত্রি নামে,
অশ্রুজলের স্মৃতি জড়ানো
ভাবনাগুলো প্রাণের মাঝে জমে।
চাঁদের হাট ভেঙ্গে গেছে,নিবে গেছে সব তারা।
আকাশভরা নিবিড় নির্জনতা,
শত শতাব্দীর নির্জনতা।

সব কিছু ফেলে আঁকড়ে ধরি
এক গভীর শূণ্যতা।
এই কি আমার জীবনের সম্বল?

হে সারথী , শুনাও তোমার শঙ্খনিনাদ,
ভেঙ্গে দাও আমার রুদ্ধ কপাট,
ললাটে আঁক মুক্তির তিলক,

রিক্ত কর সব রিপুর ভান্ডার।

চলার পথে তোমার রথে

নিয়ে যাও অন্য এক চাঁদের হাটে,

এক নতুন ঠিকানায়।

স্মৃতিচারণ

আদিত্য চক্রবর্তী

আইকম বাইকম তাড়াতাড়ি,
যদু মাস্টার শ্বশুরবাড়ি।
রেল কম্ ঝমাঝম,
পা পিছলে আলুর দম।

এই কয়েকদিন ধরেই উপরোক্ত ছড়াটি মনের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে আর নিজের অজান্তেই গুনগুন করে আওড়িয়েই যাচ্ছি। কিছুতেই বুঝতে পারছিলাম না কেন এরকম হচ্ছে। তার পরেই হঠাৎ মনে হল তাই হবে। ছোটবেলাকার ভাগলপুরে কাটানো দিনগুলো মনকে বড়ই নাড়া দিয়ে উঠেছে। জানিনা বয়স যত বাড়ছে, জীবনে ফেলে আসা দিনগুলো সব মনকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে সেই সব সুন্দর দিনগুলোর কথা। আসলে কি জানেন তো, ছোটবেলায় এই রেল গাড়ির যাতায়াত, ওদের আনাগোনা, সেই ঝম্ ঝম্ করে চোখের সামনে দিয়ে চলে যাওয়া, সব অদ্ভুত মনে হতো। সেই কয়লার ধোঁয়া উঠতে দেখে কেমন মনে হতো এক বিজয় গর্বে ওদের কেমন যেন একটা ডোন্ট কেয়ার ভাব। ভাগলপুরে আমি বড় হয়েছি। হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা পাশ করে অবশ্য লেখাপড়ার সূত্রেই এবং চাকরির জন্য চলে আসি ওখান থেকে। ভাগলপুরে আমাদের বাড়ির পেছনেই সাহেবগঞ্জ লুপ লাইনে যাতায়াত করতো কলকাতা বা দিল্লি গামী ট্রেন। অবশ্য তখন সর্বসাকুল্যে আপার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস, দানাপুর ফাস্ট প্যাসেঞ্জার, বারাউনি প্যাসেঞ্জার, গয়া প্যাসেঞ্জার ট্রেন। ছোটবেলায় আমাদের গর্ব ছিল ভাগলপুর জংশন স্টেশন বলে। আমাদের আশেপাশে সাহেবগঞ্জ জংশন আর অন্য পাশে জামালপুর জংশন। কিন্তু ওরা তো ভাগলপুর জংশন এর তুলনায় ছোটখাটো। এই ভেবেই গর্ব হত। ভাগলপুর থেকে মান্দারহীলের ট্রেন আর বারারি ঘাটের ট্রেন শুরু হতো তাই ভাগলপুর জংশন স্টেশন। কিন্তু সাহেবগঞ্জ বা জামালপুরে তো মাত্র একটা করে ট্রেন শুরু হতো তাই ভাগলপুর

জংশন ওদের তুলনায় দুই গুণ বড় তাই না? আমাদের বাড়ির পেছনদিকে যখন ট্রেন আসার অথবা যাওয়ার শব্দ পেতাম সবকিছু ছেড়ে ছুটে চলে যেতাম দোতলায় বাড়ির ছাদে। আর হাঁ করে চোখ বড় বড় করে দেখতাম ট্রেনের গতিবিধি। সে আমাদের যে আনন্দের অনুভূতি এখন আর বুঝিয়ে বলার ক্ষমতা আমার নেই। সারা শরীরে অদ্ভুত এক শিহরণ জেগে উঠতো। কি জানেন তো বয়সের সাথে সাথে ছোটবেলাকার এইসব অল্পেই আনন্দ পাওয়ার যে আনন্দটুকু কোথায় যেন মিলিয়ে গেছে আর বুঝতেই পারি না এই অনুভূতিটুকু।

দানাপুর ফাস্ট প্যাসেঞ্জার সন্ধ্যা সাতটায় ভাগলপুর স্টেশনে এসে থামত। আর জল এবং কয়লা ইঞ্জিনে ভর্তি করে বিশ মিনিট পরে ছাড়তো হাওড়া স্টেশনের উদ্দেশ্যে। আর ছিল মেল সার্ভিসেসের কামরা। চিঠি পোস্ট করা যেত আর পরের দিন সকালেই সাতটার মধ্যে হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে যেত সেই চিঠি। অবশ্য বেশিরভাগ সময় সকালে ট্রেন হাওড়া স্টেশনে পৌঁছাবার আগেই আটকে যেত। ডেলি প্যাসেঞ্জার ট্রেন শুরু হয়ে যেত বলে হাওড়া পৌঁছাতে বেশিরভাগ দিনই দশটা কি এগারোটার পরই লাইন ক্লিয়ার পাওয়ার পরে পৌঁছতো। রেলটা থামত ছাইগাদা জংশনে। আসল নাম লিলুয়া। এখানে একটা বিরাট গর্ত ছিল ইঞ্জিনের কয়লা ফেলার জন্য। তার ওপরেই ইঞ্জিন এর পোড়া কয়লা ফেলত। পোড়া কয়লা না বলে বলা উচিত আধপোড়া কয়লা। অর্ধেক পোড়া অবস্থাতেই থাকত। আর সেই গরম পোড়া কয়লা তোলার জন্য প্রচুর মহিলারা ঝুড়ি হাতে লাইনের পাশে অপেক্ষা করতো কখন রেলটা যাবে আর তখন সব মহিলারা দুমদুম করে হাত পুড়িয়ে সেই আধপোড়া কয়লাগুলো বাড়ি নিয়ে যাবে। আর বাড়ি গিয়ে উনুনে আগুন দেবে আর রান্নাবান্না করবে বলে। হাওড়া স্টেশনে আমরা একটা ট্যাক্সি নিয়ে হাওড়া ব্রিজ পেরিয়ে সোজা গিয়ে উঠতাম বিজু কাকার বাড়িতে শ্যামবাজারে। কলকাতায় গেলে ওখানেই উঠতাম আর থাকতাম আমরা। আমাদের আওয়াজ পেয়ে বিজু কাকা ওপরে উঠে এসে বাবাকে বলতো ‘ভোলাদা, তোমরা এসে গেছ! ঠিক আছে রেস্ট নাও আমি একটা রোগী দেখেই আসছি একটু পরে’। একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। ওই দানাপুর ফাস্ট প্যাসেঞ্জার ট্রেনের মেইলবক্সে বাবা চিঠি পাঠাতো, সবাইকে চিঠির উত্তর দিত খুবই নিয়ম করে। ওই ট্রেনে চিঠি পাঠালে কলকাতায় চিঠি পৌঁছে যেত তাড়াতাড়ি তাই। আর বেশিরভাগ সময়ই আমাকে চিঠি নিয়ে ভাগলপুর স্টেশন যেতে হতো ট্রেন ছাড়ার আগেই। আমাদের বাড়ি থেকে রেল লাইন ধরে ছুটে গেলে মিনিট দশেকের বেশি লাগতো না ভাগলপুর জংশন স্টেশনে পৌঁছাতে। মাঝে মাঝেই একটু আমার দেরি হয়ে গেলে দেখতাম গার্ড সাহেব দানাপুর ফাস্ট প্যাসেঞ্জার ট্রেন কে দাঁড় করিয়ে অপেক্ষা করতো কখন উকিলবাবুর ছেলে চিঠি দিতে আসবে। পাঁচ দশ মিনিট পর্যন্ত অপেক্ষা করতে দেখেছি অনেক সময়। তখনকার দিনে এসব সম্ভব ছিল। আজকালকার দিনে কেই বা কাকে চেনে বা এতটা খাতির করে। সবাই ছুটছে সবকিছু পেছনে ফেলে এগিয়ে চলার জন্য।

ভাগলপুর এর কথা মনে পড়লেই মনে পড়ে আমাদের সেই স্কুল, সিএমএস হায়ার সেকেন্ডারী স্কুলের কথা। এটা খ্রিষ্টান মিশনারি স্কুল ছিল। সিএমএস স্কুলে আমার দাদারা সবাই এখানেই পড়াশোনা করেছিল। একেবারে গঙ্গার ধারে। প্রায় কাছাকাছি ছিল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, রাজবাড়ি, সিনহা বাড়ি, গৌরীদির বাড়ী ইত্যাদি। শরৎচন্দ্রের ইন্দ্রনাথ-শ্রীকান্ত গল্পের ইন্দ্রনাথ ছিলেন গৌরীদির দাদু। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন আনেক সাহিত্যিক যেমন বনফুল, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, দিব্যেন্দু পালিত আরো অনেকে। রাজবাড়িতে এই যেমন অশোক কুমার, কিশোর কুমার ইত্যাদি - তারা ছিল ঐ বাড়িরই ছেলে। আর ছিল সিনহা বাড়ি। আমার তো ধারনা যদি সিনহা নামের পদবী আর তারা যদি বাঙ্গালী হয় তাহলে তাদের সঙ্গে ভাগলপুরের কোন না কোন যোগ আছে। তপন সিনহা ভাগলপুরে আমার বড়দার সঙ্গে একসঙ্গে পড়েছে কলেজে। লেখাপড়া করলে হয় খুব ভালো ছাত্র আর প্রথম ডিভিশানে পাস করবি নয়তো তপুর মত ফেলু হয়ে পাস করবি। মাঝামাঝি সেকেন্ড ডিভিসনএ পাস করলে জীবনে কিছুই করতে পারবি না। বড়দা বলতো। তপু কে দেখ। কত বড় সিনেমার ডিরেক্টর।

আমাদের ভাগলপুরে আরেকটা স্কুল ছিল দুর্গাচরণ হাই স্কুল। আমাদের স্কুলে যেমন বাংলা, হিন্দি সব পড়ান হত, দুর্গাচরণ স্কুলে কেবল বাংলা ছিল। এই দুর্গাচরণএর ছাত্র ছিল তপন সিনহা। আমাদের এই দুই স্কুলের মধ্যে সব সময় খুবই রেষারেষি লেগে থাকত, বিশেষ করে ক্রিকেট ম্যাচ নিয়ে। মনে আছে সেবার আমাদের স্কুলের ক্যাপ্টেন আমি। আর যেহেতু আমাদের স্কুলের একজন খেলোয়াড় কম হয়েছিল আমাদের গেমস টিচার জোব স্যার আমাদের হয়ে খেলবেন ঠিক হল। তখন দুর্গাচরণ স্কুলের কানাইদা ঠিক করলেন উনি ও তাহলে মাঠে নামবেন খেলতে দুর্গাচরণ এর হয়ে। দুর্গাচরণ ক্রিকেট টিম বরাবরই খুবই ভালো। তারপর ভাস্কর ঘোষ বলে একজন ওপেনিং ব্যাটসম্যান খেলছে। পরে ভাস্কর বিহার রঞ্জি ট্রফিতে খেলেছে ওপেনার হিসেবে। আগের দিন প্রচন্ড বৃষ্টি হয়ে গেছে। আগেই বলেছি আমাদের সিএমএস স্কুল গঙ্গার ধারে। তাই একটুতেই মাঠে জল জমে যায়। বলাই বাহুল্য আমাদের স্কুলের মাঠে খেলা শুরু হল। সবাইকার মনে খুবই উত্তেজনা। কি হবে, কে জিতবে, কে হারবে, এই চিন্তা। মনে মনে তো আমরা জানি দুর্গাচরণ এর সঙ্গে ক্রিকেট খেলে কোনদিনও আমরা জিততে পারিনি আজও পারবোনা। জোব স্যার আমাদের উইকেট কিপার। আমাদের বল করা শুরু করলো রাজীন্দর। রাজীন্দর কোনদিনও ক্রিকেট খেলেনি। কিন্তু তাল গাছে চড়ে চড়ে হাতে পায়ে প্রচন্ড জোর। মোটামুটি বল করতে শেখানো হয়েছিল কারণ আমাদের দলে বোলার খুব একটা ছিল না কেউ। যাইহোক প্রথম ওভারে বারো রান তুলল ওরা। দ্বিতীয় ওভার আমি শুরু করলাম। আমি লেগস্পিন বল্ করে থাকি। সাধারণ পীচে পাঁচ কি ছয় ইঞ্চি বল ঘোরে ভেতর থেকে বাইরের দিকে। সেদিন যে সব অদ্ভুত কাণ্ড হচ্ছিল বলার নয়। জল জমা মাঠে বল

ঘুরতে শুরু করলো এক ফুট করে কি আরো বেশি। বাবারে বাবা, কি কান্ড! ব্যাটসম্যান কিছুই করতে পারছে না। পায়ের ফাঁক দিয়ে, হাতের মাঝ দিয়ে সবগুলো বলই উইকেটে গিয়ে লাগতে শুরু করলো। আর দুর্গাচরণ এর একটা একটা করে উইকেট পড়তে শুরু করলো টপাটপ। ভাস্করও খুব একটা সুবিধা করতে পারলোনা। দুর্গাচরণ সর্বসাকুল্যে একুশ রান করে সবাই অলআউট হয়ে গেল। একটা চার মেরে আমাদের জিতিয়ে দিলো সাত উইকেটে রুনু। সেদিনের এই অদ্ভুত ব্যাপার আজও ভুলতে পারিনি আমি।

বলাইবাবুর চেম্বার (বনফুল) আমাদের বাড়ি আর পাড়ার খুব কাছেই ছিল। আমাদের পাড়ার ঠিক পাশের পাড়ায়। আর বলাইবাবুর দাদা ভোলা বাবু, মানে অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় আমাদের পাড়াতেই থাকতেন। বলাইবাবু প্রায় রোজই সকালে একটা রিক্সা করে মাছের বাজারে যেতেন মাছ কিনতে আমাদের রাস্তার সামনে দিয়েই। আমাদের বাড়ির সামনের বারান্দাতে পাড়ার ছেলেরা সরস্বতী পুজো করতো প্রতিবছর। আমরা সারারাত ধরে প্রতিমা সাজাতাম, ফল কাটতাম প্রসাদের জন্য এবং পূজার জন্য অন্য কাজ করতাম। খুবই আনন্দের সময় ছিল তখন। সেবার আমরা বলাই বাবুর চেম্বারে গেছি চাঁদার খাতা নিয়ে চাঁদা চাইতে। আমাদের দেখে বললেন কেন দেব চাঁদা অন্য পাড়ার পুজোর জন্য? আমাদের তখন ছাত্র বেলা। খুবই রাগ হলো। ভাবলাম ঠিক আছে মজা দেখাতে হবে। সেদিন রাতারাতি বলাই বাবুর বাড়ি গিয়ে সামনের সিঁড়ির উপর রাখা সব ফুলের সুন্দর সুন্দর টবগুলো তুলে নিয়ে চলে এলাম আমরা। আর তাই দিয়ে আমাদের প্রতিমা সাজালাম। যথারীতি সকালে মাছ আনতে বেরিয়ে আমাদের বাড়ির সামনে এসে থমকে দাঁড়ালেন বলাইবাবু। “এদিকে এসো তোমরা। আমার বাড়ির মনে হচ্ছে এই ফুল। এক্ষুনি এগুলো আমার বাড়িতে গিয়ে রেখে এসো।“ ওনার মুখে কিন্তু রাগের কোন চিহ্ন ছিল না। হেসেই বলেছিলেন ওই সব কথা। কিন্তু আমাদের সাহস হয়নি সেই আদেশ অগ্রাহ্য করার।

ভাগলপুরের আরেকটা গল্প মনে পড়ছে। আগেই বলেছি আমাদের স্কুলের পাশেই রাজবাড়ী। একদিন শীতকালের সুন্দর সূর্য উঠেছে। স্কুলের গেটের পাশে গিয়ে দেখি কয়েকজন ছাত্র গোল করে ঘিরে বসে আছে কাউকে নিয়ে। এগিয়ে গিয়ে দেখি ওমা সয়ং কিশোর কুমার। একটা স্যান্ডো গেঞ্জি আর লুঙ্গি পরে আড্ডা মারছে চা আর সিঙারা সহযোগে। কিশোরকুমার তখন ওই সব সিনেমা করত যেমন ঝুমরু, কড়োরপতি, হাফ্ টিকিট ইত্যাদি। সেরকম নাম হয়নি তখনও।

আর রেলগাড়ির কথা দিয়েই এই স্মৃতিচারণ শুরু করেছি তাই রেলগাড়ির গল্প না বললে আমার নিজেরই খুব খারাপ লাগবে। সেই জন্যই একটা গল্প আপনাদের জানাচ্ছি। এই লেখার সঙ্গে এই গল্পের কোনো সামঞ্জস্য সত্যিই নেই। তবুও শুনুন।

অঙ্কে দুর্বল দু'জন চাকুরি প্রার্থী ইন্টারভিউ দেওয়ার জন্য বসে রয়েছেন। প্রথম জন ভেতরে ঢুকলেন।

অফিসারঃ মনে করুন, আপনি ট্রেনে জার্নি করছেন। সফর কালে আপনার অত্যধিক গরম লাগছে। আপনি কী করবেন?

চাকুরি প্রার্থীঃ ট্রেনের জানালা খুলে দেবো।

অফিসারঃ বাহ, বাহ্ খুব ভালো। এখন বলুন, জানালার ক্ষেত্রফল ১.৫ বর্গ মিটার, ট্রেনের কামরার ঘনফল ১৩ ঘনমিটার, পশ্চিমদিকে ট্রেনের গতিবেগ ৮০কিমি/প্রতি ঘন্টা এবং হাওয়ার গতিবেগ দক্ষিণ দিকে ৫ মাইল/ প্রতি সেকেন্ড হলে ট্রেনের কামরা ঠাণ্ডা হতে কত সময় লাগবে?

চাকুরি প্রার্থী সব ঘেঁটে কোনো উত্তর দিতে পারলেন না। বেরিয়ে এসে দ্বিতীয় চাকুরি প্রার্থীকে প্রশ্নের বিষয়ে জানালেন। এবার দ্বিতীয় জন ভিতরে ঢুকলেন।

অফিসারঃ মনে করুন, আপনি ট্রেনে সফর করছেন। যাত্রাকালে আপনার অত্যধিক গরম লাগছে। আপনি কী করবেন?

দ্বিতীয় চাকুরি প্রার্থীঃ কোট খুলে দেবো।

অফিসারঃ তারপরেও গরম লাগলে কী করবেন?

দ্বিতীয় চাকুরি প্রার্থীঃ জামা খুলে ফেলবো।

অফিসারঃ তারপরেও গরম লাগলে?

দ্বিতীয় চাকুরি প্রার্থীঃ প্যান্ট খুলে ফেলবো।

(বিরক্ত হয়ে) অফিসারঃ তারপরেও গরম লাগলে?

দ্বিতীয় চাকুরি প্রার্থীঃ গেঞ্জি খুলে ফেলবো।

(প্রচণ্ড রেগে গিয়ে) অফিসারঃ তারপরেও যদি গরম লাগে?

দ্বিতীয় চাকুরি প্রার্থীঃ আমি তাহলে বাকি টুকু বস্ত্রটাও, তার - মানে জাঙ্গি--

(ভীষন ভাবে বিরক্ত হয়ে) অফিসারঃ থাক, থাক দয়া করে আর কিছু খুলতে হবে না। কি করবেন বলুন?

দ্বিতীয় চাকুরি প্রার্থীঃ স্যার, সব বস্ত্রই খুলে দেবো, আমি গরমে মরে যাবো, কিন্তু কোনোভাবেই ট্রেনের জানালা খুলবো না।

আরেকটা এই ট্রেন সম্পর্কে গল্প মনে পড়ল। সেটাও বলে ফেলি। আশা করি কিছু মনে করবেন না। এটাতেও আসলে আমার কোনও কৃতিত্ব নেই। আমার হাস্যরসের গুরুদেব শ্রীযুক্ত শিবরাম চক্রবর্তীর লেখা কোনও একটা গল্পের। দুই সহযাত্রী ট্রেনের দুই জানলার ধারে বসে আছে। একজনের হঠাৎ কি খেয়াল হলো উঠে গিয়ে জানলাটা দুম করে বন্ধ করে দিল। করে দিয়ে বলল আপনার কোনো আক্কেল নেই মশাই। আমি মরে যাচ্ছি ঠান্ডায় আর আপনি জানালা খুলে বসে আছেন? বলে নিজের সিটে এসে আবার বসে পড়ল। যে ভদ্রলোক জানলা-খোলা সিটের পাশে বসেছিল সে দুম করে আবার জানালাটাকে খুলে দিল। খুলে বলল, আপনার কোন আক্কেল নেই মশাই, এই গরমে আপনি জানলা বন্ধ করলেন। এই কিছুক্ষণ ধরেই ধুমধাম চলতে থাকল। একজন বন্ধ করে তো আরেকজন খুলে দেয়। রীতিমত ঝগড়াই লেগে গেল দুজনের মধ্যে। গার্ডসাহেব অনেকক্ষন ধরে দেখছিল এইসব কান্ড-কারখানা। এবার একটু বেশ রাগ হল গার্ডসাহেবের। আপনারা কি করছেন মশাই তখন থেকে, আওয়াজ করছেন, আমার ঘুম হচ্ছে না, একবার খুলছেন, একবার বন্ধ করছে, কি ভেবেছেন টা কি? আমার শীত করছে সেজন্য আমি বন্ধ করছি আর ওনার গরম লাগছে বলে খুলে দিচ্ছেন, বলে এক সহযাত্রী। গার্ডসাহেব খুবই হো হো কোরে হেসে বলল এবার, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন না এই জানলাতে তো কোনো কাঁচই নেই। জানালা বন্ধ করলেই বা কি আর খোলা থাকলেই বা কি?

এই স্মৃতিচারণের শেষ অংশটা তেও আমার কোন কৃতিত্ব নেই। এটা তপন সিনহার লেখা আর বনফুলের বলা গল্প। নিম্নোক্ত গল্পটা বনফুলের শেষ গল্প। জানা নেই এটা কোথাও ছাপা হয়েছিল কিনা কখনও। তার কিছুদিন পরেই বনফুল মারা গিয়েছিলেন। যাই হোক দুজনেই ভাগলপুরের, তপন সিনহা আর বনফুল। সুতরাং আমার একটা নস্টালজিয়া তো আছেই। আপনাদের সঙ্গে শেয়ার না করে পারছি না ("বনফুলের শেষ গল্প" -- তপন সিনহা/শারদীয় যুগান্তর ১৩৮৬)।

“একদিন সকালবেলা একান্তে নিজের ঘরে বসে লিখছি, হঠাৎ আমার একজন সহপাঠী বন্ধু ঘরে এসে ঢুকলো। তার চেহারা দেখে চমকে উঠলাম। উস্কোখুস্কো চুল, জীর্ণ বসন, চোখ দুটো জবা ফুলের মতো লাল। ঘরে ঢুকেই ও বললে, “এ কি রে, তোর এ রকম দৈন্য দশা কেন? ভাঙা টেবিল চেয়ারে বসে লিখছিস! তোর জানালার পর্দা ছেড়া, বিছানার চাদর নোংরা। দাঁড়া তোকে কিছু টাকা দিই”- বলে খস্ খস্ করে একটা পঞ্চাশ লক্ষ টাকার চেক লিখে দিল।

বুঝলাম ওর মাথা খারাপ হয়েছে। তবুও জিজ্ঞেস করলাম, “তুই এত টাকা পেলি কোথায়?”

ও হেসে বলল, “আরে বাঃ, তুই জানিস না, আমি সারা ভারতবর্ষের একছত্রাধিপতি সম্রাট।”

বুঝলাম, একেবারে উন্মাদ হয়ে গেছে। বড়ো কষ্ট হল। আমরা একসঙ্গে পড়তাম। ভালো ছাত্র ছিল। বিরাট সম্ভাবনাও হয়তো ছিল। আমার এক ডাক্তার বন্ধুকে ডেকে ওর চিকিৎসার দায়িত্ব তার ওপরে দিলাম।

মাস দুয়েক পর হঠাৎ সে আবার এল। সম্পূর্ণ ভাবে সুস্থ হয়ে উঠেছে। কিন্তু কেঁদে ফেলে বলল

"তুই আমার এ সর্বনাশ কেন করলি? আমি তো উন্মাদ হয়ে সব কিছু ভুলে মহা আনন্দে ছিলাম। তুই আমার চেতনা ফিরিয়ে দিয়ে আবার আশা নিরাশা হতাশা সুখ দুঃখ হাসি কান্না দারিদ্র্য সম্বন্ধে সচেতন করে দিলি-কেন? কী দরকার ছিল?"

এর মাসখানেক পর বনফুল আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন ....

পূজোর মেলা

অরুণ শংকর রায়

পূজো পূজো বনবাদারে পূজো পূজো গন্ধ,
পূজোর মাসে খেঁকশিয়ালের পাঠশালাটি বন্ধ।
বন্ধ আপিস, বন্ধ এখন হাকিম হুলোর কোর্টটা,
বন্ধ রাজার দরবারি আর সিংহরাজার ফোর্টটা।
বাজছে সানাই, বাজছে বাঁশি, বাজছে কাঁসর ঘন্টা,
বাদ্যি শুনে উঠলো নেচে সিংহরাজার মনটা।
রাজার সাথে সবাই নাচে তাইরে-না-না নাইরে,
পূজোর মেলা বসেছে এক শহর থেকে বাইরে।
রকমারি সব কাপড়জামা চকমারি সব গয়না,
ভাবছ মিছে বানিয়ে বলা এমনতরো হয়না।

সত্যি দেখ সিংহরাজা পরেন জহর কোটটা,

সিংহীরানী আলতা দিয়ে রাঙান বসে ঠোঁটটা।
উট ভেবোনা উটকো মোটেই থাকেন সমরখন্দে,
বুক ফুলিয়ে চলেন হেঁটে রঙীন গলাবন্ধে।
নকল করা চুল পরে আর আমেরিকান জিনরে,
বেড়ালমাসির সখ চেপেছে সাজতে হিরোইনরে।

বাঘবাবাজী চুমড়ে বলেন আতরমাখা গোঁফটা,
“পূজোর মেলায় সামলানো দায় নাগরা পরার লোভটা।
আগ্রা থেকে সদ্য কেনা দামটি অনেক ধরলে,
পা দুটো ভাই আপনি হাঁটে নাগরাজোড়া পরলে।”
গজহাতির গিন্নি বলেন উর্দ্ধে তুলে শুঁড়টা,
“এই দেখনা আমার হাতের ম্যাচিং করা চূড়টা।
চন্দ্রমণি চূড়ের সাথে ম্যাচিং করা কানটা,
পরলে পরে আপনি আসে লারেলাপ্পা গানটা।”

রামছাগলের বেগম বলেন শুঁকে গোলাপ ফুলটা,
“তোমরা তো ভাই দেখছনি কেউ আমার হীরের দুলটা।
দুলজোড়াটি কোথায় পেলাম ইচ্ছে যদি জানতে,
এইতো সেদিন বিদেশ গেলাম লন্ডনেতে আনতে।”
খেঁকশিয়ালি খেঁকরে বলে, “থামাতো তোর গল্প,
কান্জিভরম শাড়ির আমার দামটি ভাবিস অল্প ?
হংকেতে গেলাম নিজে শাড়িটাকে কিনতে,

তিনটি বছর লাগল জানিস আসল চিনতে।”

ভালুকমামাও সবার সাথে দিচ্ছে কষে পাল্লা,
প্যারিস থেকে আমদানি তার খানদানি আলখাল্লা।
সোনার জলে পালিশ করা জাফরি কাটা বুকটা,
“এমন জিনিষ কেউ দেখেছ?” নাচিয়ে বলে মুখটা।

ফ্যাসান-পাগল মানুষরা সব কাপড়চোপড় ছাড়ছে,
ফ্যাসান-পাগল বনের পশুর কাপড় পরা বাড়ছে।
কান্ড এসব দেখে দেখে কূল না যত পাচ্ছি,
ঘুরতে থাকে মাথাটা আর ততই খাচ্ছি।

হিজিবিজি বিদ্যা

হাসু ঘোষ

আর সব বাঙালির মতো সহজ পাঠের হাত ধরে আমারও পথ চলা শুরু। তারপর বড় হওয়ার সাথে সাথে ধীরে ধীরে রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প, কবিতা, উপন্যাস ও প্রবন্ধের সাথে অল্পস্বল্প পরিচয়। পরিচয় তাঁর আঁকা ছবির সাথে। আরো পরে জেনেছি যে রবীন্দ্রনাথ লেখার খসড়া করতে গিয়ে ‘ডুডল্’ করতেন। সত্যি বলতে কি ডুডলগুলি তেমন আকর্ষনীয় লাগেনি শুরুতে। কেমন যেন অপ্রচলিত আকার ও আকৃতির সমাবেশ বলে মনে হত। আবার কখনও বা মনে হত এ যেন কথা ও ছবির এক রহস্যময় প্রকাশ। মনে মনে কৌতুহল জাগতো, কি লিখতে চেয়েছিলেন তিনি খসড়ার শুরুতে, আর তাকে আড়ালই বা করলেন কেন ছবি দিয়ে?

এই ভাবনাটা হয়তো একেবারে অমূলক নয়। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ কৌতুক করে তাঁর এই শখকে বলেছেন “হিজিবিজি বিদ্যা”। নিচের চিঠিতে পুত্রবধূ প্রতিমা দেবীকে লেখা নাতনী পুপের চিঠি প্রসঙ্গে এর উল্লেখ আছে। যেখানে উনি বলছেন যে তাঁর লেখার ভুল ঢাকতেই এই হিজিবিজি বিদ্যার প্রয়োগ। যেন এ ছিল তাঁর নিছকই এক ছেলেমানুষী শখ।

(১৮) ওঁ

বৌমা,

পুপের চিঠি পেলুম। ভাগ্যি তোমরা ব্যাখ্যা করে দিয়েচ তাই ভাবার্থ টা বোঝা গেল। কিন্তু ভাবার্থ টা ওর আসল অর্থই নয়, ওটা বাজে কথা। ওর নাচ যেমন নিরর্থক, ওর লেখাও তেমনি, হিজিবিজির নৃত্য। এই হিজিবিজি বিদ্যায় আমারও সখ আছে, তোমরা জান। এই জন্যে ওর চিঠির ঠিকমত উত্তর আজ সকালে বসে বসে লিখেছি। আমরা যাঁর অতিথি তিনি আমার টেবিলে হঠাৎ এটা দেখে অবাক্। পাছে ভাঁজ করতে গিয়ে এটা নষ্ট হয়ে যায় সেইজন্যে তিনি এর জন্যে একটা বড় লেফাফা আনবার ব্যবস্থা করচেন। এলে পাঠিয়ে দেব। কিন্তু এর একটু ব্যাখ্যা করাও দরকার। গোড়ায় আমি কাগজটার উপর ওর যত আদরের নাম সব লিখ্‌লুম, পুপে, পুপু, পুপসি, মাডাম পাভ্লোভা দি সেকেণ্ড, রূপসী, উর্ব্বশী, রম্ভা, মেনকা, তিলোত্তমা ইত্যাদি ইত্যাদি, তার পরে যেমন

করে আমার লেখার ভুলগুলোকে চাপা দিই তেমনি করে নানা আঁকা জোকা দিয়ে ওগুলো সম্পূর্ণ চাপা দিয়েচি। এর মর্ম্ম হচ্চে এই, ঐ আদরের নামগুলো সমস্তই ভুল, আমার মন থেকে এর সমস্তই আমি সরিয়ে ফেলবার চেষ্টায় আছি। ওর সম্বন্ধে আরো একটু আমি আলোচনা করেচি, সেটা কবিতায়— সেটাও তোমাদের কপি করে পাঠাব।

দ্বিতীয় বার পেরু যাবার আয়োজন যখন পাকা করেচি এমন সময় কাল ডাক্তার এসে আবার আমাকে পরীক্ষা করে বললেন, আমার কিছুতেই যাওয়া চলবে না, না সমুদ্রপথে, না শৈল পথে। তাতে হঠাৎ বিপদ ঘট্‌তে পারে—আমার যথাসম্ভব সম্পূর্ণ বিশ্রাম দরকার। তাই এখানকার আশা ছেড়ে দিয়ে য়ুরোপে পাড়ি দেবার ব্যবস্থা করা গেল। জানুয়ারির ৩রা তারিখে। ইটালিয়ান জাহাজ, নাম Giulio Cesare। জেনোয়া বন্দরে পৌছব, জানুয়ারির শেষ সপ্তাহে।

ডাক্তার বল্‌চে আমার দেহযন্ত্র কোনোটা বিকল হয় নি, কিন্তু ফতুর হয়ে গেছে। আর বেশি খরচ সইবে না। চুপচাপ করে থাক্‌লে, পুঁজি যা আছে তা নিয়ে আরো কিছুকাল চলে যাবে। ডাক্তার বলে, আমার

মুস্কিল এই যে বাইরে থেকে আমাকে দেখলে বোঝা যায় না, আমার এমন দেউলে অবস্থা। আমি নিজে অনেকদিন থেকে এটা বুঝতে পারছিলুম কিন্তু বোঝাতে পারছিলুম না। যাহোক এবার দেশে ফিরে গিয়ে অকাজের সাধনায় উঠে পড়ে লাগতে হবে। সে সব কথা মোকাবিলায় আলোচনা করা যাবে।

এতদিন পরে ডিসেম্বরের পয়লা থেকে এখানে গরম পড়েচে। আজ মেঘ করে ঝোড়ো হাওয়া দিচ্চে— আবার হয় ত কিছুদিন ঠাণ্ডা পাওয়া যাবে। আমার বিশ্বাস তোমাদের ওখানে ঠাণ্ডার অভাব কিছুই নেই। লণ্ডনের নবেম্বর যে কি পদার্থ তা আমি খুব জানি। ডিসেম্বরে ক্রিস্টমাসের কাছাকাছি বরফ পড়া সুরু হবে।

[বুয়েনোস এয়ারিস, ১৯২৪] শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অন্যদিকে আবার ঐকতান কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, “যেথা পাই চিত্রময়ী বর্ণনার বাণী / কুড়াইয়া আনি৷” অর্থাৎ তিনি কথা ও ছবির মেলবন্ধনে সমৃদ্ধতর হবার কথা বলেছেন৷ স্বভাবতই প্রশ্ন আসে এই ডুডলগুলি কি কেবল লেখার ভুল ঢাকতেই সৃষ্টি, নাকি এর অন্য কোন অন্তর্নিহিত অর্থ আছে! রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞদের মতে অবশ্য এই ডুডলগুলি বহুমাত্রিক৷ কারন এই ‘ডুডল্’ করতে করতেই নাকি রবীন্দ্রনাথের ছবি আঁকার জগতে প্রবেশ, যা তাঁর সৃষ্টিক্ষেত্রে আরো একটি মাত্রা সংযোজন করেছিল৷ অন্যদিকে, লেখার খসড়া হিসেবে হিজিবিজি বিদ্যার ব্যাবহার তো আছেই৷ সে কথায় পরে আসছি৷

রবীন্দ্র গবেষকরা মনে করেন তাঁর হিজিবিজি বিদ্যার হাতেখড়ি পূরবী এবং খেয়া কাব্যগ্রন্থের খসড়াতে, ১৯২৪ সাল নাগাদ৷ অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাপ্তির পরের সময়কার কথা৷ যেখানে উনি লেখার মাঝে মাঝে কিছু কিছু শব্দ কেটে দিয়েছেন বা ঢেকে দিয়েছেন কালি দিয়ে, আর সাথে সাথে তৈরি হয়েছে নানান নিয়মিত ও অনিয়মিত আকার৷ যেমন, কিছু সামঞ্জস্যহীন প্রাণী বা উদ্ভিদ, কোথাও বা উদ্ভিদ ও প্রাণীর সংমিশ্রণ ঘটেছে। কখনো কখনো এই আকৃতি গুলি পরস্পরের সঙ্গে জুড়ে গিয়ে সম্পৃক্ত হয়ে নতুন একটা আকার তৈরি করেছে। আবার কখনও ঢেউ বা লতার মতো কথার মাঝে মাঝে ছবি হয়ে ফুটে উঠেছে। বিশেষজ্ঞরা অনেকে এর সাথে প্রাগৈতিহাসিক গুহাচিত্রের ও মিল পেয়েছেন। নিচের ছবিগুলিতে দেখা যায় যে রবীন্দ্রনাথ কেমন লিখতে লিখতে আঁকছেন, আবার আঁকার ছলে লিখছেন। এইভাবে কথা ও ছবির ভারসাম্যে এক আশ্চর্য্য সাবলীল যোগসূত্র তৈরী হয়েছে৷

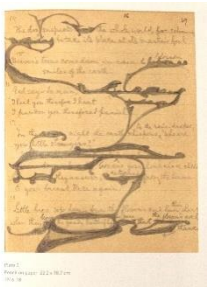

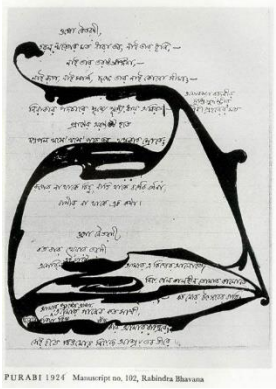

PURABI 1924 Manuscript no. 102, Rabindra Bhavana

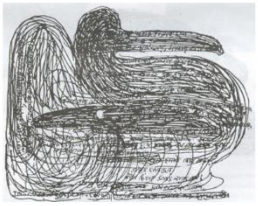

বিশেষত্ঃ, এই হিজিবিজি বা ডুডল্ ছবিগুলির উৎপত্তি কিন্তু উপজাত হিসেবে। কারণ এই ডুডল্ করে ঢেকে দেওয়া শব্দগুলি প্রকাশিত বইয়ের পাতায় দেখা যায় না বরং খসড়া হিসেবেই থেকে যায়। এইভাবেই হিজিবিজি বি্দ্যায় ধরা পড়ে স্রষ্টার ভাবনার ওঠাপড়ার কথা৷ যেখানে তার মূল উদ্দেশ্য ছিল কবিতা, গল্প বা উপন্যাস লেখা৷ ছবি আঁকা নয়৷ পরবর্তীকালে, রবীন্দ্রনাথ নাটকের

খসড়াতেও ‘ডুডল্’ করেছেন। যেমন দেখা যায় নিচের রক্তকরবী নাটকের খসড়াতে৷ সময়ের সাথে সাথে ডুডলের ধরণে পরিবর্তনও এনেছেন, আর যোগ করেছেন রঙের ব্যবহার৷

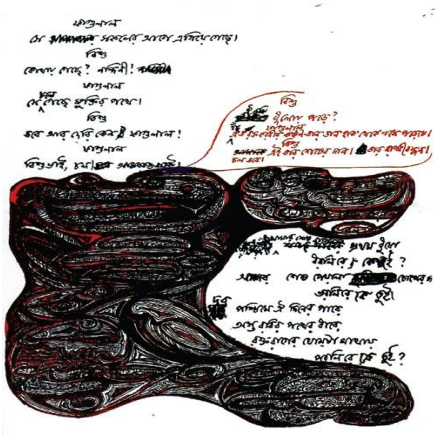

সেই অর্থে রবীন্দ্রনাথের এই ডুডলগুলি তাঁর সৃষ্টির এক বিকল্প বহিঃপ্রকাশ বলা যায়৷ যেখানে একটি সম্ভাবনা অন্য রূপ নিয়ে দেখা দিল৷ প্রতিবিম্বিত হল ভিন্ন মাধ্যমে- রেখাচিত্রে; যা কেবল উদ্দ্যেশ্যহীন হিজিবিজি কাটা নয় বরং অনেক বেশি সম্ভাবনাময় এবং তাৎপর্য্যপূর্ণও বটে। যাতে প্রতিফলিত হয়েছে স্রষ্টার চিন্তাস্রোতের পরিবর্তন৷ অনেক সময় এমনও মনে হয় যে এই ডুডলের আড়ালে না জানি কি অধরা মাধুরি লুকিয়ে রইল চিরকালের তরে৷ রবীন্দ্রনাথের “সকল গানের ভান্ডারি” দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর যেমন কবির বাতিল করা অনেক লেখায় সুর বসিয়ে তাকে রবীন্দ্র সংগীতের রূপ দিয়েছেন, সেইরকম তো হতে পারত ডুডলগুলির ক্ষেত্রে৷ ডুডলগুলি সেই অর্থে বহুব্যঞ্জক, যা স্রষ্টার ভাবনার পরিবর্তনগুলিকে এখানে প্রতিবিম্বিত করেছে৷ হয়ে উঠেছে তাঁর ভাব প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম, যা একান্তই তাঁর নিজের, যেখানে তাঁর অনুশীলনের আরম্ভ এবং পর্যায়ক্রমে সম্পূর্ণতা পেয়েছে চূড়ান্ত সৃষ্টিতে, গল্প বা কবিতা, নাটক বা প্রবন্ধের আকারে৷

রবীন্দ্রনাথের একটি বহু আলোচিত ডুডল্ হল তাঁর আত্মপ্রতিকৃতি যেখানে উনি কতগুলি পুনরাবৃত্তিক জটিল রেখাচিত্রের মাধ্যমে ওনার মুখাবয়বকে তুলে ধরেছেন৷ এটি অনেক পরের দিকের সৃষ্টি বলেই, গবেষকদের মতে, এতে আধুনিক শিল্পের প্রতি রবীন্দ্রনাথের অনুরাগ ধরা পরেছে, যখন উনি নিয়মিত ছবি আঁকছেন৷

এইবার দেশে গিয়ে অনেক বছর পর শান্তিনিকেতনের উত্তরায়ন প্রাঙ্গণে গিয়েছিলাম। উত্তরায়নের বিচিত্রা ভবন- যেখানে রবীন্দ্র সংগ্রহশালা ও গবেষনাগার, সেখানে সজত্নে রক্ষিত রবীন্দ্রনাথের খসড়াগুলি দেখে আবারও রোমাঞ্চিত হলাম চিত্রময়ী বর্ণনায়। আরো অনেকের মত আমারও প্রশ্ন যে তাঁর এই খসড়ার "হিজিবিজি বিদ্যা" কোন ভাবনাটিকে ব্যক্ত করে, ছবির না কথার? নাকি উভয়েরই?

সূত্র:
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৩৪৯) চিঠিপত্র। শ্রীমতী প্রতিমা ঠাকুরকে লিখিত। তৃতীয় খন্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনালয়।
সুকান্ত চৌধুরী (২০১০) মেটাফিজিক্স অফ টেক্সট, কেমব্রিজ উনিভাসিটি
কবিতা সিংহ (২০১৩) দ্য এনিগম্যাটিক ইমেজারি ইন টেগোর'স ডুডলস্, এ পিয়ার রিভিউড জার্নাল অফ ভিস্যুয়াল আর্ট এন্ড পারফর্মিং আর্ট
নীলাঞ্জন ব্যানার্জী (২০১১) উইংস্ অফ মিসটেকস্: ডুডলস্ অফ রবীন্দ্রনাথ টেগোর, পুনশ্চ।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (২০২০) খসড়া চিত্র, গুগল ইমেজ।

মাউন্টিদের সাথে কয়েক বছর

ডক্টর ঝর্ণা চ্যাটার্জী

সম্প্রতি পুলিশের নৃশংস ব্যবহার ও অত্যাচারের খবর টিভিতে, রেডিওতে, পত্র-পত্রিকাতে এবং সামাজিক সংবাদ মাধ্যমে প্রচুর প্রাধান্য পেয়েছে। খবরে যখন একদিন দেখলাম বিশাল দৈত্যাকৃতি মানুষ জর্জ ফ্লয়েড তার শেষ ক্লিষ্ট নিঃশ্বাসটুকু দিয়ে শিশুর মত তার পরলোকগতা মায়ের জন্য আকুল হয়ে কাঁদতে লাগল, তখন আমার চোখের জল বাধা মানে নি। অনস্বীকার্য্য যে এটা অমানুষিক ব্যবহার। কিন্তু আমি দীর্ঘকাল

রয়্যাল কেনেডিয়ান মাউন্টেড পুলিশ বা আরসিএমপিতে কাজ করেছি, পুলিশ অফিসারদের স্বাভাবিক মানুষ হিসাবে খুব কাছে থেকে দেখেছি। তাই আজ এই প্রবন্ধ লিখতে ইচ্ছে করল। টেলিভিসনে যা দেখেছি সেটাই এদের সম্পূর্ণ পরিচয় নয়।

আরসিএমপি ক্যানাডার দশটি প্রদেশ আর তিনটি টেরিটরিতে শান্তিরক্ষার কাজে নিযুক্ত ছিল তখন - সম্ভবতঃ এখনও আছে। প্রায় ২০,০০০ কর্মচারী, পুলিশ, সিভিলিয়ান আর সরকারী কর্মচারী মিলিয়ে। বিশাল সংগঠন, আর অত্যন্ত পদমর্য্যাদা সচেতন। আমার কাজ ছিল সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে গবেষণা করে রিপোর্ট লিখে পলিসির জন্য সুপারিশ করা, যাতে এই সামাজিক সমস্যাগুলোর সমাধান হয়। কয়েকটি বিষয় বস্তুর উল্লেখ করছি - অর্গানাইজড ক্রাইম, ইয়ুথ গ্যাং, ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স, এথিক্যাল ইনটেলিজেন্স ইত্যাদি। এগুলো ইংরেজীতে লিখলাম এবং লিখব, সবার বুঝতে সুবিধে হবে বলে। 'ইয়ুথ ক্রিমিন্যাল জাস্টিস এ্যাক্ট' জারী হবার আগে আমাকে জাস্টিস ডিপার্টমেন্ট চার বছরের জন্য ডেকে নিয়ে গিয়েছিল, সারা ক্যানাডাতে এই আইন জারী হবার আগে ও পরে যে সব রিসার্চ প্রজেক্ট হয়েছিল তার দেখাশোনার দায়িত্বে।

কিন্তু আজও আমি যে রিসার্চ প্রজেক্টের সব দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলাম বলে সব চেয়ে বেশি আনন্দ অনুভব করি সেটা হোল রেস্টোরেটিভ জাস্টিস ইভ্যালুয়েশন প্রজেক্ট। এই কাজে আমাকে সারা ক্যানাডাতে ঘুরতে হয়েছে, প্রতিটি প্রদেশে গিয়ে অজস্র মানুষের ইন্টারভিউ নিতে হয়েছে। কত রকমের লোকের সাথে দেখা হবার সুযোগ পেয়েছি সেই সময়ে। আবার ভ্যানকুভারের কুখ্যাত অঞ্চলে একজন পুলিশ অফিসারের সাথে তার গাড়িতে মাঝ রাতে টহল দিয়ে দেখেছি কি ধরণের বিপজ্জনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয় এদের।

এবার আসল প্রসঙ্গে ফিরে যাই। একদিন প্রেইরির এক ধূ ধূ-করা মাঠের মধ্যে নির্জন হাই-ওয়েতে গাড়িতে করে যাচ্ছি এক শহর থেকে অন্য শহরে। গাড়ি চালাচ্ছে এক

ছ'ফিট তিন ইঞ্চি লম্বা পুলিশ অফিসার। আমরা নানা বিষয়ে আলোচনা করছিলাম। কথায় কথায় ক্রিসমাস উৎসব পালন করার প্রসংগ উঠল। আমি হিন্দু, ভারতে আমার জন্ম। তাই ও জিজ্ঞেস করল আমরা ক্রিসমাস পালন করি কিনা। আমি বললাম ছোট বেলা থেকে দেখেছি সব ধর্মের উৎসবে ভারতীয় লোকেরা সানন্দে অংশগ্রহণ করে, তাই এখানেই বা অন্য রকম হবে কেন। আমি ওকে জিজ্ঞস করলাম ওরা কি ভাবে এই উৎসব পালন করে। ও বলল "আমরা ডিনারের পরে সবাই মিলে একটা মুভী দেখি।" "কি রকম মুভী?" এবারে ওর উত্তর শুনে আমি হতবাক - "আমরা প্রতি বছর রিচার্ড এ্যাটেনবরোর 'গান্ধী' মুভীটা দেখি"।

হ্যাঁ, সত্যি। এই রকম কিছু পুলিশ অফিসারও আছে মাউন্টিদের (আর-সি-এম-পি) মধ্যে। জাতীয় 'আইকন' হিসাবে এরা ছিল সম্মানিত, আইনানুগভাবে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য এরা এই সংগঠনে যোগ দিয়েছে, যাদের লাল সার্জের পোষাকে সত্যিই অপূর্ব সুন্দর দেখতে লাগে। আমাদের ডিপার্টমেন্টে মীটিংএর বড় ঘরটিতে ছিল এক মস্ত বড় গোল টেবিল। রাজা আর্থারের নীতি অনুযায়ী কেউ অন্যের চেয়ে এই টেবিলে বড় বা ছোট নয়। যদিও আমরা জানতাম বাস্তব সত্যি। তবুও আমার ভাল লেগেছিল।

একদিন আমি অন্য কোনও ডিপার্টমেন্টের একটা মীটিং থেকে ট্যাক্সি করে অফিসে ফিরছিলাম। ফেরার কয়েক মিনিট পরেই এক দীর্ঘ-দেহী অফিসার এসে আমার সামনে দাঁড়াল । "কি ব্যাপার?" "তুমি ট্যাক্সিতে বেল্ট বাঁধ নি কেন?" উঃ কি করে ও জানল রে বাবা! আমি ভয়ে ভয়ে উত্তর দিলাম "আমি তো ট্যাক্সিতে কখনও বেল্ট বাঁধি না"। "কেন বাঁধ না? ট্যাক্সিওয়ালার কাছে তুমি হচ্ছ শুধু একজন ভাড়াটে প্যাসেঞ্জার। বাড়ির লোক বা বন্ধু যদি ড্রাইভ করে বা তুমি যদি নিজে ড্রাইভ কর, তাহলে তুমি বিশেষ এক জন। তাই ট্যাক্সিতে আরও বেশি দরকার বেল্ট বাধা"। আমাকে এত সুন্দর ভাবে নিরাপত্তার জন্য উপদেশ দিয়ে চলে গেল।

আমি সিভিলিয়ান মেম্বার, জন্মেছিলাম ভারতে, পাঁচ ফিটও নই উচ্চতায়। কিন্তু খোদ কমিশনার থেকে শুরু করে সাধারণ কনস্টেবল পর্যন্ত প্রত্যেকের কাছে অনেক সম্মান পেয়েছি, এঁদের কারো ব্যবহারে কখনও মনে হয় নি আমি কারো থেকে ছোট। এঁরা পদমর্যাদা সম্পর্কে সচেতন বলে আমাকে "ডক্টর চ্যাটার্জী" বলে সম্বোধন করতেন সবাই। ভিয়েনাতে ইউ-এন এর একটা বিশ্ব-সম্মেলন হয়েছিল ২০০০ খৃষ্টাব্দে। আইনমন্ত্রী এ্যান ম্যাকলেলানের নেতৃত্বে পুরো কেনেডিয়ান ডেলিগেশন যাবে সেখানে। বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট থেকে একজন দুজন করে প্রতিনিধি নিয়ে। আরসিএমপি থেকে মাত্র দুজন নির্বাচিত হল - একজন ডেপুটি কমিশনার আর এই নগণ্য রিসার্চ অফিসার। দশ-পনেরো জন অনুবাদকসহ সেই বিশাল প্রেস্টিজের বিশ্ব-সভায় আমরা বসলাম পাশাপাশি, আর বলার সময় কমে যাওয়ায় এই বিষয় (রেস্টোরেটিভ জাস্টিস) সম্পর্কে আমিই জানতাম বলে ওঁকে কি করে আমাদের বক্তব্য আর একটু সংক্ষিপ্ত করতে হবে সেই সম্পর্কে পরামর্শ দিচ্ছিলাম। আর এ ছাড়াও আমাকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল ওখনে একটা সেমিনারে এই বিষয়ে বলার জন্য।

আমার পরিবারে গুরুতর অসুস্থতার সময়ে সেই খবর জানতে পেরে একজন এ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার এলেন আমার অফিসে। বললেন "তোমার যে কোনও অসুবিধের বা প্রয়োজনের কথা জানাতে দ্বিধা কোরো না। আমরা নিজেদের লোকেদের দেখাশোনা করি"। আর সত্যিই তার কোন ব্যতিক্রম হয় নি। কারণ আমি ছিলাম ওদের "নিজেদের লোক"।

আমি গর্ব ও আনন্দ অনুভব করি যে অনেকগুলো বছর আমি আরসিএমপিতে কাজ করেছি আর আমার মাউন্টি সহকর্মীদের ভাল ভাবে দেখবার সুযোগ পেয়েছি। ওদের আমি ভুলতে পারব না, সব সময়ে মনে রাখি যে ওদের মধ্যে বেশির ভাগ লোকেই "শান্তির কর্মী" - পিস অফিসার।

Enjoying lunch with my Mountie-and Civilian-colleagues at Fraud Centre

Author with a Mountie constable

Calcutta: The British Gateway to India

Sourendra K. Banerjee

Calcutta (the anglicized name of Kolkata) was officially founded by Job Charnock in 1690 who used the name in his writing to the Mughal emperor Aurangzeb (1658-1707). Charnock came to Madras in 1657, became East India Company's Governor of Bengal in 1686. The company official of Dacca used the name Calcutta with Charnock who by his diplomacy and tenacity earned Aurangzeb's favour of trading licenses to the company. Charnock cleverly saw the potential of British settlement in Bengal. He and his son-in-law Charles Eyre negotiated through an influential man in Behala and bought rights of collecting revenue of the three villages Sutanati, Govindapur, and Dihi Kolkata from their Bengali landlords in 1698. Aurangzeb's grandson Azim-us-san was then Bengal's ruler. Charnock married a Bengali (either a would-be 'Sutee' or more likely a Muslim woman). He died in 1692/3 and was buried in the backyard of St. John's Church. Charnock started Fort William (near the present Writers' Building) that was completed later but damaged during the battle of Plassey.

The name Kolkata has a rural origin. Kol (O as in 'ode') means lap, as well as an indentation of a riverbank, which at some places makes a natural harbor or ghat where boats or small ships can anchor. This happens especially in alluvial soil like the Hugli river. After a few years, the river may change the flow due to heavy sedimentation. This is called Kata (both as a in father, t as in top) or to cut. Together Kolkata is a plausible name. Also Kalighat (mother Kali in Calcutta or Bengal's presiding deity, nearby Posta has had a temple but the present Kalighat temple was built in 1809 by the descendants of the original Seller of the villages to the British (as an atonement). The British were familiar with the name Calikat on the western coast of India. These all contributed to the name of Calcutta.

We will discuss the state of European coastal countries and a short history of India for a better perspective of the title of this article.

Henry VIII (1489-1509) was a very powerful monarch who proclaimed himself as the Head of the Church in England which was the culmination of reformation. Renaissance in England also culminated which saw Byron (1788), Keats (1792), Shelly (1772), Shakespeare (1564), and many others. England and European Nations made tremendous progress in science and literature. The monarchy was very powerful, but people were conscious of their power and were proud of their "nationhood". Any legislation in England needed the

approval of both houses even during Henry 8th's time. The coastal nations advanced in navigational sciences and equipped their ships with cannons (brought by Jesuits from the Manchus, Mongols, and Chinese) and gunnery. Johnson Amwell (1730) cautioned "war causes misery". But power corrupts (Shakespeare). Michael Drayton (1563) wrote:

"You great human mind

Go and subdue

Get the pearl and gold

Let the cannons roar

For getting the wide heaven."

The European coastal Nations (with the tacit support of the church) literally did that, not only for gold but also for the profitable reservoirs of West Africa as trade for Slaves, plundering and killing and shackling able-bodied men, women and even pre-pubescent children for money. Their priests were preaching 'the savages' about the man being a child of their monotheistic God's. Mighty Islam also engaged itself in slave-trade in Morocco, Tripoli Zambia, etc. The Coastal European countries in the West started finding sea routes to India and the far East. Columbus of Spain believed he was going to India, instead discovered Cuba (1493) and South America. Americo Vespucci found Brazil and confirmed a new landmass which was named America in his honour. Portugal was very expert in nautical sciences. Dias found the route to Cape of Good Hope. Following the same root, Vasco da gama reached the West coast of India in 1497. He was a good sailor and an also ruthless general in warfare. With sophisticated and savage military raids conquered Goa and controlled all the ports on the west coast of India (including Cochin by 1510). This is the time when the Lodi dynasty in India was trembling and Babar was to come. Later Babar and Akbar's power stopped further Portuguese expansion.

In 1600 Queen Elizabeth I signed a charter for the East India Company (E.I.Co) for trading. By 1685 they had trading ports in Surat, Bombay, and Madras, Calcutta, and Dacca. The Portuguese had one in Bengal in 1535. The French East India Company had the same in Malabar, Pondicherry, Chandannagar by 1673. Gujrat was independent as Bengal (with Lodi sovereignty) was. Muslim rulers' only occupation was personal gain, impose Shiite Islam in India and oppress the Hindus (93% of India was Hindus) and fight with other power-sharing Shiite Muslim rulers. India was neither a state nor a nation since the 8th or 9th

century with skirmishes amongst themselves (no brutality), but it was a great civilization bounded and inspired by Hindu pantheistic scriptures with lofty and logical philosophy. This made the Indians peace loving if not docile. Ramanuj & Nimbiarkar wrote on theism with devotional appeals to a personal god. Their 11th-century writings are highly acclaimed even now by western intellectuals. Joydev (1179-1205), Chaitanya Dev (1485), Balav Acharya (16th century) wrote gospels of love and they are examples of superb religious philosophy. Tulshidas's Hindi Ramayana (Sri Ram Charit Manas, middle of 16th century) came to soothe people's minds. But Indians lacked sciences* and skills in modern warfare. India's powerlessness but riches made it a target of ravages by the brutal raids of the middle east countries, especially the Afghans. As early as 711 Mohammad Kassem raided Sindh and Indus valley. A rebel slave became master of a part of Afghanistan and founded Ghaznibad in central Afghanistan with himself as the ruler. His son Mohammed Ghajini invaded Indus valley (1005) and Lahore (1015) and imposed Islamic conquest in India.

The slave dynasty soon under his influence extended the whole of the Indo-Gangetic plain. Genghis Khan of west Turkestan ravaged west of Indus in 1221 but went away fearing Delhi's might. Iltutmis further extended the Muslim conquest (1304). Then another barbaric attack by the Transoxian Taimur long (who ruled Afghanistan). pillaged Delhi (1398) and conquered many small States in India. After a lot of slaughter, he abruptly chose the king of Multan as his governor in India and left with lots of treasures. Then, Allaudin Khilji and Mohamad Tuglok consolidated their conquest of most of India by the 15th century. Tughlok divided India in 23 governments including five in the south. The Hindu masses were treated as subjugated subjects and Muslims were rulers with all privileges. Gujrat and Bengal managed to remain autonomous. The Delhi Sultanate itself had Turko Afghans as their sovereigns. The Lodis were military, feudal overlords. Their sole mission was to impose Islam or Hindus oppression. But military factions led by various Lodi clans were infighting and Delhi Sultanate became weak. It was an opportune time for the Turko Mongolians. Babar became the Sultan of Forgan (1494) and invaded Afganistan, Kabul (1504), and Kandahar (1507). His uncle was a general of Ibraham Lodi who rebelled. Babar invaded Delhi and easily defeated him in 1526. The Rajputs under Rana Sanga and the Afgan Amirs joined Ibrahim Lodi but lost. So did the Bengali rulers (Shia clan members of the Lodis) in 1529. Babar's' Mughal rule extended in India beyond any earlier Muslim rulers. He died and his son Humayun became Mughal Badshah (1530). Sher khan of Bengal (a Lodi faithful) drove Humayun out of India in 1540. He became Sher Shah – the ruler of India. Sher Shah made roads

from Punjab to Bengal, introduced coins, taxation equitable for Hindus, Muslims, and the states. He died in 1554 and Humayun returned as Badshah in 1555, but died in 1556. Akbar succeeded and at the age of thirteen, became effectively the Mughal Badshah in 1562. He built a huge army (200,000 men and 500 war-elephants), lots of cannons and Hindu servants to carry the cannons and serve the soldiers and elephants. He conquered Gujarat, Surat, and (by defeating Duad) Bengal. He tried to appease the Hindus. He defeated the valiant Rajputs. Except for Rana Pratap of Mawar, all Rajput kings became his subordinates. The army was expensive. He raised taxes for richer Muslims (and even reduced them for Hindus). There was however a shortage of revenue. He built magnificent cities (Allahabad, Fatehpur Sikri), had 30,000 palace horses. The average subject became poor, children were sold and even human flesh was in the market. He was succeeded by Jahangir (1605-28) who lost Kandahar. Jahangir suppressed Ahmednagar and the Rajput kings. His generals were unhappy. His son Shahjahan became Badshah in 1627. He recaptured Kandahar suppressed rival generals in the South and dominated Deccan. But his wife's death and disobedient children demoralized him. He built Tajmahal and the peacock throne. The period from Akbar to Shajahan is noteworthy. The Europeans started coming to India for 'trade'. In England, King Charles I was executed in 1649 by Cromwell who had ideas of republicanism or public rule instead of the monarchy but suddenly he died in 1658. Monarchy was back in 1660 with Charles II as the king. Europe was in full renaissance. Galileo (1564-1642), Kepler (1567-1680), Descartes (1596-1650) were the pillars of modern sciences. That was a huge contrast with India.

Aurangzeb became the Mughal Badshah in 1658 after killing his three brothers and confining his father Shahjahan in a fortress where he died in 1666. During the 1655-1700 famines, pestilence reigned, industry was ruined. Aurangzeb ruled from 1658 to 1707. His passion was conquest and oppressing non-Sunni Muslims, and especially the Hindus. He imposed vassalage on the king of Assam in 1661, seized Chittagong. He subdued Afghan tribes and occupied Vijayan, Golconda, and Bijapur in the South and appointed an overlord (one of his generals) Nizam-ul-Mulk to supervise the Deccan including the Nawab of Carnatic. The British and French so-called 'trading posts' (with an army to back up) were there. Marathas did not like the Mughal rule in India, especially the Muslim rulers of the South. Aurangazeb similarly had a viceroy (his grandson) for Bengal, Bihar, Orissa, and Oudh which disintegrated and Mughal authority started loosening after Aurangzeb's demise. Aurangzeb's religious persecution (jizya tax on Hindus), suppressing

many Hindus and Sufi Muslims, desecration of temples (idols from temples used as footsteps in mosques) caused great resentments. Sufi Faquirs and Hindu Monks revolted in 1650. They were trampled by war elephants. Rajputs protested such incidents in Bundelkhand in 1659. They were crushed. Jaths revolted with the same result. Aurangzeb's son being unable to crush the revolt, fled and given refuge by the Marathas who became very powerful. They, under Shivaji Bhoshley's leadership oppressed the Mughals in the Deccan and even Delhi. After Shivaji, under his son Shambhuji 'Marahatta power' was established in the Southern peninsula from the Arabian Sea to the Bay of Bengal. Simultaneously Sikh power also grew. Guru Nanak (1469-1539) originated the Sikh Scripture 'Granth Saheb'. The 5th Guru Arjun (1581-1601) forged a nation. In 1675 their Guru Tej bahadur was executed by Aurangzeb. The 10th and last Guru Govind Singh (1675-1708) made the Sikhs a martial group against Aurangazeb. It is a pity that Marathas, Sikhs and the Rajputs did not unite. In the meantime, Mughal treasury was going bankrupt. The army was highly pampered. They became jewel-decked privileged class. The poor people starved. Aurangzeb could not trust anybody and hated his children. He died in in 1707. After his death Mughal power started crumbling. Nadir shah (a Turkoman from Khoran) attacked Afghanistan and then India and pillaged Delhi. In 1756 Ahmed Shah of Afghanistan seized Kandahar and Kabul. Then he invaded again in 1761. Marathas joined the Mughals but suffered heavily in the 3rd battle of Panipat. Instead of helping them, the Sikhs seized Punjab and in 1764 declared Punjab as a Sikh state with Lahore as capital. This turmoil had its effect in the Deccan.

The foreign trading companies (like French E.I.Co and British E.I.Co, backed by their military) had been granted licenses by the Mughal emperors. But they (specifically the French) started interfering in local warfare and played politico-mercenary roles. The French general Dumas got the title Nawab by the Mughals for helping the Mughals. The British took the opposite sides for its own interest. Dupleix defeated the British and took Madras but in 1748 restored it to the British according to the Aix La Chapelle treaty. Calcutta was won by the French (1786) but returned to the British by the Treaty of Paris in 1763. But these were not political but trade wars (with military help) as far as India was concerned. The Hindus preferred English against the French generally.

During the last years of Aurangazeb, his grandson Azum-ul-san ruled Bengal. Alipur was his personal property and was 'presented' to Warren Hastings. The mansion of Belvedere was built, later it became

National Library (1953). Murshid Kuli Khan ruled Bengal from 1717 to 1729. He divided Bengal in 23 zamindaris with all (but Birbhum) Hindu landlords. He prudently Bengalized Bengal with Bengalis, as high officers (mostly Hindus). Many Hindus (Seths, Bassaks, etc. from Delhi, Agra, Oudh) came and became very rich and village owners (like Ratan Sarkar). Ratan Sarkar started schools to teach Bengali, Sanskrit, Persian to company officials. Old Bengali manuscripts show a cluster of villages (Agradip, Chadandip, Nawavadip, etc) as busy trading centers. The Portuguese had a trading post in 1667. Job Charnock provided the Mughal Badshah a good British physician and got trading licenses for 40 rich areas around Calcutta. After (and during) Aurangazeb's rule, Marathas were fighting the Mughals and needed money. They would destroy by burning the fields of crops to deprive the chasing Mughal army food for humans and cavalry. They would come to Bengal for 'toll', if unable to give, they would mercilessly burn the villages. They were known as 'Bargis'. The British Company dug a ditch (1742) around South-east of Calcutta. But it was not needed as Marathas co-operated against Nadir Shah and Ahmad Shah. The ditch was filled up and became lower and upper circular roads. In 1709 Calcutta was about 3 miles long and a mile wide. Job Charnock built 'Fort William (18ft tall), 360ft wide and 650ft long) for military protection when needed.

A new ruler at Bengal Siraj-Ud-Dowla was in Murshidabad. He was haughty as well as a debauchee. Even rich Hindu officers under him were annoyed as their young daughters were not safe. Some conservative Muslims also resented. The British EI company was making lots of money and did not share the revenue due to the Nawab (State). Siraj angrily attacked them in 1756 and captured some British and ordered them to put in a cell in Fort William. In the hot and salty June night, many were found dead. The British made huge propaganda about 'the blackhole_massacre' by Savage black Indians. Karl Marx in a footnote in his history book (and many others) said this was a non-event. It pales in comparison to the Jallianwala Bagh massacre of civilians (men and women) by the British. The British sent Robert Clive a ruthless General from Madras with some soldiers and cannons to take revenge. Clive cleverly found Sivraj's enemies (Mirzafar, Umi Chand, and Jagat Seth whose daughter was molested by Siraj) in high positions. He promised that Mirzafar will be the next Nawab. By false propaganda that his canons are all wet, made Siraj's huge army complacent.

There was a battle in Plassey (20 miles from Murshidabad), Clive won in 1757 (June 29). The Nawab was pensioned off in 1764. Clive forced to be compensated (money, 900 sq. miles of land - 24 Parganas) Mirzafar was the new Nawab. Clive enforced Bengal to become a British protectorate in 1756/7. During the battle of Plassey Roger Drake was the company's governor of Bengal who was hiding in a French warship. Raja Nagarkrisha Deb, a rich and influential Bengali helped the British. Clive returned to Bengal as company's governor and commander in chief in 1765. The company officials become very rich and most of them became like Muslim Nawabs. They built huge mansions around Russel and Sudder streets. The area around Fort William became a white town. The local rich people built huge houses around Sutanati. They had Bazars (markets), communities of artisans (like Darji Para, Kumar Tuli, Muchipara, Kalutola etc). Tagore's well-known Joresanko house in 1784 and Rajendra Mallick's palace were built in 1834 (near Kumartuli). These areas became Black town. Such a division was encouraged by Robert Clive (now Lord of Plassey) who became unpopular in Britain and went back in 1772 and he killed himself in 1774.

A new act was passed in the British Parliament which put the E.I. company in Parliamentary control (1773). Under this new act, Warren Hastings arrived in Calcutta as the first Governor General of India in 1772. Calcutta became the de facto capital of India as Hastings had to deal with Haidar Ali and his son Tipu of Mysore and the Marathas. Haidar of Mysore attacked the Carnatic, Hastings made a treaty of Mangalore but Lord Wellesley besieged Mysore and the ruler Tipu Sultan was killed (1800). In 1801, Lord Wellesley defeated the Marathas and other Hindu small States in the South. In 1801 the British forced the Mughal Badshah to become a British protectorate. Practically, the British rule started in India. In 1809 Ranjeet Singh (1791-1831) of Punjab made a treaty with the British and ruled Punjab. But the Sikhs rebelled in 1846 and were crushed by British forces and the British took over Punjab. Assam was already annexed in 1826 and Burma even earlier in 1819. The last attempt of the 19th century against the British was the Sepoy mutiny of May 1857 (Sepoy is an Indian soldier in the British army). It started because the cartridge of the bullets contained pork and beef lard. The sepoys of Meerut who refused to use them were severely punished. This started over the whole of North India (Calcutta remained quiet) under the leadership of Raja Nana Sahib. Both Muslims (because of pork) and Hindus (because of beef), participated. Many British officials were massacred. But by July 1858 the mutiny was crushed and the British entered Delhi. (Which was technically the Mughal emperor's Capital City). The company was held responsible by London for this heinous incident.

Gradually India passed to the crown. In 1876 formally Queen Victoria was proclaimed as the empress of India. Job Charnock's and Robert Clive's Calcutta remained as India's capital until 1912 when Lord Harding the viceroy moved to Delhi.

Calcutta as Captial of British India

Sourendra K. Banerjee

The author's article Calcutta as the British Gateway to India's discussed the founding and naming of Calcutta (1690) mainly by Job Charnock and later consolidated by Robert Clive and the first governor-general (1772-85) Warren Hastings. After Aurangzeb's death (1709) Maratha power grew and used to raid Delhi. They needed money and raided vulnerable Hindu areas for the toll. Bengal was a victim. They used to terrorize for toll and while going back burn the agricultural land so that pursuing Muslims and their cavalry could not have food. The company in 1742 with the help of the rich Hindus in the Calcutta area dug a ditch in the Southeast end. But the Marathas and Mughals had an understanding before the battle of Panipat and the ditch was not needed, instead it was filled up and become lower and upper Circular Roads (1799). Major William Tolly in 1775/76 dung up a channel on dried up Hoogli river between Kalighat and Tollyganj (ganj means a market) to shorter the distance for the company's small ships. This made Tollyganj, Kalighat, and nearby areas highly thriving commercial centers.

Calcutta's urban activity lies in Chitpur Road (roughly east of College Street). Chitpur was a small place in the north with a temple of the deity 'Chitteshswari' known in the early 17th century. The place was surrounded by jungles with animals. The bandits used the jungles as a hiding place. A rich landlord built a new temple in 1739 with a 165 feet tower as a navigational landmark. Chitpur road was built to connect with Kalighat. Rich Bengalees began moving to lanes reins and roads off Chitpur road. They built mansions with a mixture of Indian and European styles. Many rich and prominent people like Rajendra Mullick, Tagores of Pathuriaghat and of Jorasanko. The northern areas on or about Chitpur Road become "Black down". Rabindranath was born in 1861 at Jorasanko. We will not discuss him as much is well known. 'Black town' had mansions, but also had a cluster of areas like Darjipara, Munshipara, Kolutala etc. for artisans like tailors, cobblers, oil pressers, etc. Black town area around Sutanati the 'white town' (where white people

lived) grew around the original Fort William (started by Job Charnock in 1712, finished in 1729) which was damaged during the battle of Plassey (1758). The new fort was built north of Govindpur. The local Bengalis were forced and paid handsomely to move towards Sutanati along with the temple of Govindjee. The area came to be known as Esplanade. The white people would sneer at the local natives, though some white people (orientalist) took interest in native culture. The Black town also had two kinds of people, the Babus (a Persian honorific term (later became pejorative) who accepted that British and Europe had much to be admired for. The others will make fun of the Babus who would try to talk and act like the British. The areas of white and Black towns were very differently treated by the same municipality. Even one rainfall would cause the Black Townships flooding with filth. Tagore said this is because 'white town residents won't put up with this but we do'.

Even then Calcutta progressed. With the Western system of education and the arrival of the printing press, higher education started with Fort William College in 1800 by Lord Wellesley. This was not a traditional college but was meant to educate young company officials on how to administer, learn local languages and Sciences, and to create a class of Indians who would be like the British in life. William Carey (who was a preacher and was very learned) became a professor of Bengali. He wrote an 'English-Bengali' dictionary and many Bengali texts in the press at the college. Carey was fundamentally a missionary who founded a theological College in Serampore. Fort William College was housed in the Writers' building (and not in the fort). In 1802 civil servants of India were sent to London for education. But this college remained for teaching for the 'Bengali Service' of the company. Vidyasagar after studying at Sanskrit College (founded in 1877 at college square) was made a Pundit in Fort William College.

Hindu College was founded by some wealthy Bengalis (including Dwarakanath Tagore) in 1817, renamed Presidency College in 1855 near College Street. It became an institution of creative thinking. David Richardson (died in 1865) compiled a selection of English poetry (Shakespeare, Milton, Byron, etc.) and Henry Derozio (died 1831) inspired liberal and skeptical ideas. These two shaped the college to become a modern academic institution. Bankim Chatterjee, Madhusudan Dutta were influenced by Presidency College education. In 1817 College Street was laid out. Many book stores opened as well as Calcutta Medical College, Calcutta University Senate House came to be located there. College Square also has Bengali Theosophical Society (1882), Mahabodhi Hall (1891), University Institute Hall (1891). Near Sanskrit

College is located the Coffee House a place where intellectual groups (so-called young Bengal) met and discussed which way India should go (modern western kind or traditional Indian kind).

There were a few British orientalists who revealed the wisdom of the ancient India to the world. Charles Wilkins translated Gita in 1776. Halhed published a Bengali grammar in 1775. William James (a judge in Calcutta) established that Sanskrit may be part of the foundation of the Indo-European group of languages. In 1784 he founded the Asiatic Society of Bengal (Dwarakanath Tagore became the first Indian member in 1829). Generally speaking, the scholarship was helped and nationalism grew much more with the printing press in 1777 at Serampur and at Fort William College (this one was used by Jones and Haldeed). Soon, Bengali typeface was used in many Bengali presses. William Hickory started the weekly newspaper Bengal Gazette (in English) in 1780. The first India press was started in 1818. In Battala area in north Calcutta, they published epics, Ramayana, Mahabharata in regional languages. They also published folk stories, satire and gossips, etc.

The 'Babu' culture encouraged folk painters (Patuas) in Kalighat. The 'pata' paintings utilized strip paintings with vegetable and mineral dyes on handmade screens. They also depicted deities, they became very popular, specially showing the 'babus' (Bengalis who would pose to act and talk like Britishers"). Paper milled at Baptist mission at Serampur helped their artworks. They began using water-based colours. On damp, flat surfaces, capillary processes showed volumes on the paintings. These influenced some famous paintings (like Matisse) who saw Kalighat paintings brought by missionaries. The paintings were very popular in Bengal around 1820-1850.

Now let us discuss some prominent Indians during the later 19th century. We wouldn't follow chronology. Modhusudan Datta (1824-1873) was a genius in Bengali literature, but from an early age, he thought he should have been born in England or France so that he could be Byron or a poet like him. He became a Christian and took the name, Michael. He left home and wrote some pieces in English in Kolkata. John Bethune read them and advised him to write them in his languages to flourish his potential. He did that and proved to be a really great writer. He introduced sonnets and brought verses in Bengali, wrote epics. However, he had the ambition to go to Britain. He had married a Scottish girl named Rebecca in Madras where he was a teacher. This marriage failed. Then he married a French woman named Henriette. In 1862 he went to England to become a barrister. Then he went to France. He was deeply disappointed by White

men's snobbery. He did his bar examination. In the meantime, he lost his family inheritance. Vidya Sagor had encouraged him in writings and helped him to return home. Finally, he realized that to be a Bengali is not shameful, and rather should be a cause for pride if you are talented.

Raja Ram Mohan Ray (1772 – 1833) was possibly the pioneer to challenge the inactivity and orthodoxy of Hindu society. He was a genius cross-cultural intellectual. His father was a rich landlord who was the victim of Cornwallis's Permanent Settlement Act (1793). He quarreled with his family, and made lots of money by buying stocks in collaboration with the East India company, but did not help his parents. He was a learned person, a Hindu Vedantist. He learnt Hebrew and Persian and knew about Christian, Jewish, and Islamic religions very well. He was deeply opposed to idolatry and polytheism and in consultation with Dwarakanath founded "Brahma Samaj", which at the core is Vedantic and outwardly looks and sounds Unitarian. Though few in number, Brahma culture produced many talented people. Rammohan was an Indian classical musician and composed many "Brahma" hymns. Then he took up the cause of abolishing the tradition of "Sutee" burning which was not a problem in Bengal except conceptually. His mother or grandmother were not "Sutees". Eventually, his oratory skills in debates with Hindu pundits convinced Lord Bentinck to ban "Sutee Daho" in 1829. Mughal Emperor in Delhi was his patron (as were the company's high officers) who awarded him the 'Raja' title. He went to England in 1830. His finances collapsed in India. He died in Bristol in 1833. He kept his sacred thread always. He was buried as a non-Christian in Bristol (where Dwarakanath Tagore built a Hindu-style mausoleum.

Next notable Indian we will mention is Iswar Chandra Banerjee (Vidya Sagar) (1820-1891). He was a nationalistic, staunch Bengali Hindu. Studied in Sanskrit College, was a Pundit in Fort William College, then the principal of Sanskrit College. Afterwards, he became an inspector of schools for the south of Bengal. His writings changed Bengali prose which became standard. He wrote books for primary as well as higher grades. He set up teacher training institute in Sanskrit College. Many schools for boys grew with Bengali as the medium but Western-style education. In 1849, John Drink Water Benthune had founded Hindu Balika Vidyalaya which become Bethune School. Later the college came up. Vidya Sagar helped to add 35 free schools for girls between 1857-1868. He also took up the cause of Hindu Widows. In 1855 he wrote a Bengali treatise advocating a widow's remarriage, 1in 1856 he supervised such marriage. Vidya Sagar was

involved in many charitable works. Later in life, he spent his time with the Santhals. Vidya Sagar saw the European as equal and would become never ask any favour for himself.

Dwarakanath Thakur (1794-1846) is wrongly described as 'Babu' for target of caricature. He was a successful landlord, entrepreneur (invested in the coal mine, exporting tea to England, railway builder, promoted vessel navigating from the Bay of Hoogli river, owned ocean-going ships, etc). He was a philanthropist (patron of the Asiatic Society, Medical College, and Sans Souci Theatre). When refused in the Bengal club, he founded a party house in Belgachia where he entertained high profile people like Lord Auckland's sister who treated him as an equal. He visited England and made personal friendships with the Queen, the Prime Minister, Dickens and Thackery. However, with age, he could not keep up with business and lost his wealth and reputation. He was a great leader of India but knew that though Britishers were exploiting India, only they could give a good government.

Another Tagore namely Sourendra Mohan wrote a couple of books on classical Indian music where he used western notations. The one in English showed to the West the sophistication and mature melody of Indian music. He was awarded an honorary doctoral degree by Oxford in 1896. He founded the Bengal Music School and Bengal Academy of Music in 1871/72. He was a good nationalistic Indian with divided loyalty to the British.

We would mention Bankim Chandra Chatterjee (1838-94). He was a great writer. His writings reflected romanticism where ultimately high morality would triumph. But we will discuss his nationalistic ideas. In addition to Hindu College learning, he read the works of English Writers and ancient Hindi scriptures. He started a monthly magazine Banga Darshan in 1872 that enhanced discussions on literary criticism, religious politics, and social debates. His Anandamath (where the patriotic song Bande Mataram appeared) glorified the uprising of sanyasis and Sufi Faquirs in the years 1760-1800. They were mendicants dependent on alms from rural people (both Hindus and Sufi Muslims) and the sympathetic landlords. The East India company rulers took objection and started harassing them. In retaliation, the rebels attacked the company rulers' offices and treasuries. Warren Hastings started military operations which he justified to the company bosses in London as suppressing banditry. The rebels killed a British officer when lots of military operations started against them. The rebels in Bengal (Rajshahi, Comilla, Jalpaiguri, Dinajpur,

Chittagong,etc.) had to retract to Bihar and U.P. Ultimately they were suppressed. Bankim's Pathak and Devi Chaudirani are names who actively supported the rebels.

However, Bengal remained peaceful (some will say indifferent during the sepoy mutiny of 1857). Slight indignation arose against the British when 'indigo planters' were oppressing the peasants in the middle of the 19th century. But both Raja Rammohon and Dwarkanath instead supported the British. Most Bengalis in their heart were nationalistic but were afraid to be actively protesting for fear of losing jobs. Swami Vivekananda (1863-1902) raised India's profile in the West. One of his disciples, Sister Nivedita (Margaret Noble) was a friend of Sarala Devi (R.N Tagore's niece [1862-1945]) who started to encourage Bengali youth to take care of physical exercises, wrestling, etc. Then arose a group with the idea of fighting for freedom. Sri Aurobindo Ghosh started writing the weekly Bengali paper Jugantor, and English monthly Bandematram. His brother Barin also participated. A revolutionary group evolved led by Jatin Banerjee. Their venture failed in the broader sense. Sri Aurobindo was acquitted but he left politics and devoted himself in the theological quest at Pandicheri. Then grew the actively pro-Hindu nationalism and the Muslim resentment. But Calcutta had progressed quite a bit. Commerce grew when British freights started transporting coal from 1850. The first bridge connecting Howrah across the Hugli river was built in 1874, trams were introduced in 1884, bicycles in 1889, telephones in 1882, movies in 1898, etc. Lord Curzon became the viceroy from 1899 – 1905. He was a shameful politician (though he did a lot of good things) who used the "divide and rule" policy in Bengal and India. In 1903 he announced the partition of Bengal against the wishes of most Bengalis (but the Muslims in East Bengal who were the majority there were not unhappy). In 1905 the actual partition took place and Carzon left India. The opposition started with some people going for armed struggle, others with non-violent swadeshi movement. The resentment was great. Calcutta became a British hotspot for self-rule by India. But Muslims in Dacca (capital of East Bengal) presided by Aga khan III denounced the nationalistic movement, supported partition, pledged loyalty to the British government. Their intention was that the British government must give them back India (if and when the British left) as they got it from the Mughals. They passed the resolution for special safeguards for the Muslims. The Muslim league was founded in December 1906. They pledged loyalty to the British. The viceroy lord Harding against Lord Kurzon listened to the previous viceroy Lord Minto's (1905-1910) advice

about the partition. Bengal was united, but Bihar and Orrisa became separate states. In 1912, Calcutta ceased to be the capital of India, and Delhi became the new capital.

An Oasis in the Paddy Fields

Subhash C. Biswas

This is the story of a day in the life of a boy in the wake of the Independence of India – an excerpt from a soon-to-be published book.

At the end of winter comes spring when again the nature embellishes itself with a new blossom. Phalgun, the first month of spring, is as beautiful as the previous seasons of Sharat and Hemanta, but this beauty of Phalgun vanishes fast as the next month Chaitra comes. Chaitra is a month of continuous sun; it is the prelude to the onslaught of a ruthless summer. The Sun shines throughout the day and its merciless heat dries up everything.

On such a Chaitra day, Nimu is sitting on a window sill of his room when he spots Shiben walking in the road close to his house. Shiben too, spots Nimu when he looks up at the window. “Hey Nimu, what’re you gazing at? Want to catch a piece of the sky?” Shiben exclaims from the road.

“No, nothing. Where’re you heading Shiben in this sultry heat?”

“Umm --- nowhere in particular, just walking aimlessly. No not true, well, actually I thought I would go for an outing to explore the nature and find some beauty to fall in love with.” Shiben giggles looking up at Nimu.

“Come on, silly you! Don’t be ridiculous. If you don’t love the nature, you can’t find its beauty.”

“I know you’d say that. Well, do you want to come down and go somewhere?”

“What’s the plan?”

“I don’t have any plan, just follow the road and see where we end up.”

“I see, you’ve adopted my way of talking, eh!”

“Really! Maybe I’m learning a little bit.”

“That’s great, Shiben. I’m coming down.”

The road is well covered by trees; so it is not as bad as may be expected under a clear sky with burning sun. Nimu comes down and they both walk together.

“Now where should we go?” Shiben asks coming at a crossroad where there is no overhead covering of trees and the sun is generously pouring heat waves.

“As you said, just follow the road. I mean the road ahead of us. Shall we?”

“Sure, let’s go.”

As they get going, Shiben suddenly turns back and refuses to go ahead. “What’s the problem, Shiben? Want to go back home? Why do you change your mind so suddenly?”

“No, let’s take another road.”

“But why?”

“Look ahead and see who’s waiting for us.”

“Oh, Kunal! Shiben, is Kunal your problem?”

“Sure he is; a worthless moron, boring, unlucky company. He must be avoided by all means.”

“Shiben, my mother says a worthless thing may prove to be worthy someday. So come on, let him join us if he wants to.”

“Auntie may be right, but this fellow will prove to be an exception.”

“Sometimes exceptions are desirable, you know that, right!”

“Once again Nimu, and to my utter dislike, I’ll tolerate him only for your sake. Ok, let’s proceed.”

“Hey Kunal,” exclaims Nimu, “What’re you doing here all alone and with a chopper in hand?”

“I’m always all alone, you know it, Nimu.” Kunal stammers while gazing at Nimu smilingly with his squint eyes. “May I accompany you? I beg you.”

Kunal’s innocent countenance moves Nimu with an appeal of compassion and melts his heart. “Kunal, yes, you may. Just follow us.”

“But Shiben is looking the other way. Please Shiben, don’t be angry with me.” Kunal pleads humbly.

“Look Kunal, you know I don’t like you. Anyway, Nimu has allowed you, so you can come with us. But remember, don’t make another disastrous mess.”

“I promise,” Kunal assures.

The three boys walk leisurely, pass by the chariot house and then arrives at the vast open paddy fields where they play run and catch games. Kunal is always the loser, which makes both Nimu and Shiben ridiculously happy. After this game they walk further into the fields that are all bare after harvest. These fields extend so far into the horizon that the end line meets with the sky. Nothing can be seen in these fields except the paddy stubbles that are unpleasantly colorless standing straight on the cracked hard soil. Despite the hardship in walking in such fields and the heat, they continue trudging over the sickle-stumps of paddy plants.

“So Shiben, Kunal made us happy by losing all the games, eh! And we both relished his foolish moves.” Nimu quips with a grin.

“Ya, so far so good, but Nimu, it’s getting hotter and hotter like crazy and the sun shows no sign of mercy. I’m just wondering why we’re here. This vast area where there’re no other creatures except us. What can we do here?”

“It was your idea, Shiben. Well, now look at the dazzling blue above and the openness all around us, only three of us. Don’t you get some thrill out of this? It’s like the whole world belongs to us!”

“Yes, a damn dry world where there’s not even a vulture to be seen!”

“I’ve seen a vulture over there, far away,” Kunal cries out.

“Maybe there’s a dead cow on the ground there,” responds Nimu.

“Leave the vulture with the dead cow. Now tell me what we should do now in this barren field under deadly heat.” Shiben grumbles.

“I’ve an idea!” Nimu comes up with a comforting response as they keep on walking.

“Shoot.”

“Look to your right. What do you see?”

“Same as I see on the left, back and front, what do you mean?”

“No, no, extend your sight and see carefully.”

“Oh amazing! I see some green over there at a distance. What’s it?”

“That’s an oasis in the desert. We can go there; you’ll see some trees around a little pond, and get some cool breeze too. That piece of land also belongs to us. Let’s go there, shall we?”

“Sure, let’s go.”

“It’s so difficult to walk in these fields,” says Kunal. “The soil is all cracked giving sharp edges. It’s as hard as a stone.”

“Walk on the aisles, Kunal. It’ll be a little more to walk, but will be far easier.”

“But the heat! It’s unbearable.”

“Why don’t you pray to sun god to be merciful?”

“I’ll, maybe he’ll bring a few clouds.”

After some more walk on rough grounds under wood-splitting sun, the three exhausted souls come to the little patch of greenery and feel somewhat relieved. A few shady areas can be seen under bushy trees, which appear like gifts of God. “Come here, under this big fig tree,” cries out Nimu. “It’s cool here. We’ll sit here for some time and relax.” Nimu shuts his eyes ecstatically.

“Amazing, I mean this fig tree is amazing,” says Shiben while gazing at the tree. “I see more figs than leaves, it’s crazy! Do you eat these figs?”

“Yes of course, we eat a lot of them. They’re so tasty, I mean the fig curry. Well, next time you come to eat with us, I’ll ask mother to cook fig curry for you.”

“I’ll love it, love it for sure. But don’t forget to call me when you come here to collect figs.”

“Ok my fig-lover.” Nimu gasps with laughter.

“Nimu, Shiben, you two you relax here. I’ll be back in a few minutes,” Kunal gasps out in his own way and rushes away.

“There goes the crackpot,” bursts out Shiben. “We may now have some relief.”

“Don’t be so rude or you might have to repent later.”

“What do you mean?”

“The way Kunal ran out, it seems we’re in for a surprise. Anyway, look at the vast paddy fields, so dry and seemingly unproductive. But just let the rain come and you’ll see a grand magic. First, there’ll be almost knee-high water all over with green paddy plants popping out. And then as soon as the water goes, we’ll see dense green full-grown paddy plants filling up the fields all the way to the horizon. It’s just amazing. Our motherland is *Sujalang suphalang* as Bankim Chandra said. How kind this soil is to provide food for all of us!”

“Yes, very kind.”

“My mother says, you’ve three mothers – a mother that gives birth to you, another that feeds you which is the land and the third is your country that takes care of you. I realize it’s so true!”

“What about Ma Durga?”

“Oh, that’s your spiritual mother and those are your worldly mothers. Got it?”

“Yes, aunty is so right! I always like talking to her. Nimu, now I’m getting thoughts like yours.” “What’re you thinking?”

“After getting roasted in this burning sun, we’re now enjoying a heavenly shade. Where shall we get this if at all we’ve to leave this place? Life may never be the same if our district Khulna goes to Pakistan.”

“That’s my constant worry, Shiben. Khulna issue may not be the biggest issue of India, but it does highlight a big problem for us. Beside the natural beauty, we may lose all our properties including our big house, our orchards, gardens, ponds and all harvesting fields. The vast field you’re seeing in front of you and ten times more in the south all together will be gone. And this little oasis, a lovely piece of beauty for me, that too will be lost.” Nimu gasps a long sigh.

“Very pathetic Nimu, very pathetic! Let’s hope and pray Khulna stays in India. But I don’t understand why Khulna should go to Pakistan. It’s a Hindu majority district. Do you know why?”

“Yes, Bhavesh-da told me. Khulna doesn’t have much for India except some fertile lands. But strategically, Murshidabad, despite its Muslim majority, has lot of geographical advantage for India. So India may want to keep Murshidabad and give away Khulna.”

“But why should Pakistan agree to give away Murshidabad?”

“That’s another move in the game of chess. Pakistan absolutely wants to keep Lahore; so they may agree to give away Murshidabad.”

“Oh my God! I really don’t understand this political jargon. So let’s leave it up to the leaders.”

“Tra – la – la, I’m back,” exclaims Kunal with joy rushing back in quick steps carrying three *daabs* in hand. He gives a *daab* to each of them. “I’m sure you’ll love this in this weather of heat. This *daab* water is very refreshing I guaranty. Now drink.”

“Oh *daab*!” Nimu gazes at the *daab* in his hand with wide eyes and an open smiling mouth. And it’s nicely cut for drinking its water. I’m so pleased and surprised.”

“Thank you, Nimu.”

“It’s god-send, Kunal! In this hot sun, this is exactly what we need. We’re all thirsty. I love it. May you live long Kunal and always supply us *daab*, ha –ha – ha.”

“Me too, I’m really pleased,” says Shiben. “We really need this drink now. It’s like the lottery jackpot under the circumstances. A million thanks, Kunal.”

“I’m pleased you like it, Shiben. These *daabs* are cool, I got them from a tree in the shade,” Kunal says with an open-hearted smile. He feels obliged being able to make them happy.

“Shiben, so he has proved his worth, eh!” Nimu quibbles while drinking coconut water shutting his eyes in a spell of trance.

“Yes, he has, he has proved himself to be a good exception. Kunal, I’m sorry for what I said to you before. From now on, you’re in my good book.”

Kunal is overwhelmed, his happiness knows no bounds. He does not know how to express his joy; he only keeps on gazing at them with an innocent smile.

“I just wonder what’ll happen to the huge estate of yours, if you all leave in the worst case,” says Shiben.

Before Nimu could open his mouth, Kunal bursts out stammering, “For me, Hindustan or Pakistan, I’m not leaving this place. When everybody leaves, I’ll be the sovereign monarch of this h-u-g-e estate as I’ll be the only heir remaining.”

“Wait, wait, what did you say? Sovereign monarch!” Nimu is confounded. “Where did you learn these big words from?” Both Shiben and Nimu laugh aloud.

“You taught me and you forgot!”

“Good, good Kunal, very good! You’re learning well.”

“Someone’s utter ruin becomes someone’s plentiful gain, right Kunal?” Shiben quips.

“Poor Kunal doesn’t understand it,” remarks Nimu.

“Have you finished drinking? Give me the shells if you have, I’ll throw them in the dumping spot.” Kunal asks while approaching to collect the shells.

Everyone in the house is passing through a precarious situation in the wake of the exciting news of independence that is probably going to happen in the near future. But that news also comes with uncertainties and dire consequences that may follow. The elders of the house are eagerly waiting to

meet and talk to Rudra who has come today from Kolkata. They have gathered on the royak of the courtyard. Junik comes with him to meet the group.

“Look who has come, our hero, the freedom fighter,” exclaims Barhokali.

“I’m only Rudra Narayan DeBiswas, no hero,” responds Rudra.

“How’re you doing, Rudra?” Prabhas asks.

“I’m doing well uncle, I’m a graduate now. I’ve come home to give this good news. Besides, I may not come back here anymore given the political situation.”

“That’s it, the political situation! We like to get the latest news from you; you’re fresh from Kolkata. Tell us what’s going on. Before that, let me congratulate you on behalf of all of us. You’re a jewel of the DeBiswas house.”

“Thank you all. I’m really happy being blessed by all of you.”

“Rudra, are we really going to get independence or it’s a hoax?” Junik asks.

“No Junik-da, it’s not a hoax, no illusion. Let me give you some facts. For a long time the independence issue was critically hanging on the partition problem. An agreement between Ali Jinnah and Gandhiji seemed almost impossible to happen. But lately, that impossibility has become a reality. The Indian National Congress, the Muslim League and the Sikh community have come to an agreement with Lord Mountbatten. This agreement has come to be known as the Mountbatten Plan. According to this plan, British India will be divided into two new dominions to be known as India and Pakistan. In this division there’re two provinces - Bengal and Punjab – which will be partitioned between these two new countries.”

“So finally Gandhiji agreed for the partition of India!” exclaims Govindo. “Very strange!”

“Strange it is. Gandhi, Nehru and other leaders were all against partition; but, I guess, clashes between religious groups made it happen. Maybe some other country or countries also played a role in this game. It has been reported that Sardar Patel convinced Gandhiji that it was the only way to avoid a civil war and he reluctantly gave consent.”

“Does the plan say how the partition of Bengal and that of Punjab will be executed?” Prabhas asks.

“No uncle, it doesn’t. The boundaries of these two provinces will be determined later by a Commission to be appointed by the Governor General. As for Bengal, there already exists one partition line known as Radcliff Line established in 1905 during the reign of Lord Curzon. But as we all know, this partition left a permanent scar on the people and political scenario of Bengal. It’ll all depend on how the negotiation goes.”

“But Rudra-da, when exactly are we going to get independence anyway?” Nimu asks.

“Oh Nimu, you’re there listening, great! I like your question. Look, we’re going to get independence, that’s for sure. There’s an act called Indian Independence Act 1947 that has already received the Royal Ascent. The Prime Minister of the United Kingdom, Clemen Attlee, announced that the British Government would grant self-government to British India by 3 June 1948 at the latest. But lately, it has been accepted that it’ll happen on 15 August 1947. So that’s the answer to your question.”

“But baba Rudra, this partition matter scares me. What do you think?” Prabhas utters gravely.

“Yes uncle, it’s scary. It may even be bloody. Not may be, it has already begun.”

“What do you mean? What has begun, where?” Prabhas queries desperately in consternation. Others also show eagerness and fear about what Rudra has just uttered.

“Pre-partition pogrom has begun in Punjab, unfortunately. Since early March the Muslims have begun a killing spree in Lahore, Rawalpindi, Multan, Sargodha and many other places. Helpless Hindus and Sikhs are being targeted and slain. Unspeakable, gruesome massacre is still going on. We’ve seen killings in Calcutta and Noakhali, but what’s going on there seems more horrendous. Punjab has been gripped by a maelstrom of unprecedented violence. Now you can imagine what may happen, God forbid, after the day independence is declared officially. The exhilaration of independence may be mired by annihilation, I hope it doesn’t happen. I now understand why Gandhiji didn’t want partition.”

“Does it mean it’ll happen in Bengal too?” Nimu asks.

“No one knows, Nimu. I sincerely hope it doesn’t. You remain aware of the situation and watch how it develops. You should be mentally prepared for any outcome and to take the necessary steps.”

Suddenly, silence comes down in the gathering. The face of everyone turns gloomy showing signs of fear and worry. A grim cloud hangs on them and they smell panic and desperation fast approaching. They foresee in their mind that they are going to lose their properties – this big house, vast land, the mill, the orchards and everything – and may have to flee for their life. The lull persists for a while till when Govindo breaks the silence in a subdued voice.

“Rudra, there’s something that doesn’t add up. Until a year ago, independence was unthinkable. How’s it happening so fast and so unexpectedly?”

“Very interesting Govindo-da, it happened through a whirl of political events. Invasion by the Azad Hind Fauz under the command of Netaji was a big blow to the mighty British. They thought another such blow would be devastating. Then early last year, there was revolt by the Indian Navy. The British Government realized that the Indian Armed Forces could no longer be relied upon and that a little spark would ignite unstoppable political revolution. And then the impact of the Second World War became the most significant factor that accelerated the cause of independence. Because of economic downfall, Britain asked for help from the U.S. and that help was extended contingent upon decolonization, which meant that the U.S. and other countries would get access to the huge Indian market and other markets as well. All these reasons together forced the British to come to an agreement with our leaders.”

“Tell me Rudra-da,” Nimu has been eagerly waiting for a chance to ask, “What’s going to happen to our district Khulna? Will it remain in India or go to Pakistan?”

“I give it a 50-50 chance, Nimu. They’re still negotiating. Let’s hope for the best.”

LIVING BHOOTS IN MY HOME AND GARDEN IN OTTAWA

Dr. Nirmal Kumar Sinha, Ottawa, Canada

For two years or more, I got used to a tiny light brown spider with overall spread of its legs within a diameter of about 10mm. She used to hang out on the wall around the night light of the master bedroom washroom. Strangely she never made any web around the LED light bulb and I never saw any bugs around the light either. I used to see her in the middle of night when my bladder wouldn't tolerate any extension of the threshold of my physical limit. Following answering the call of nature, I used to tease her by finger walking on the wall. My palm with five fingers used to be like a monster spider in comparison to my little friend. Well that's what I used to think. Of course, this monster had only five arms instead of eight of real spiders. Perhaps that was a clue for weakness in the monster because she never expressed or exhibited any signs of defensive positions spiders are known to show when I used to go closer to her. She would just move a bit and wait as I move my index finger close to her. If I moved a bit closer, she just moved that much further – keeping a safe physical distance of about twice the diameter of her leg spans. We used to play for several minutes. Interestingly, she would move around the light bulb in a circle – not going to the darker areas. Obviously, I used to give up with our play and go back happily to bed. Then suddenly, she disappeared for several weeks or perhaps months. I started to miss her.

Figure 1. Encounter with my nightly resident visitor, the spider – selfie and details

Then one early morning, around 2AM, I saw my nightly friend standing on the mirror far away from the night lamp. What a joy to see her!! I mean it. Seriously! Wow, she is still living and doing well. As we are getting older, many of our friends tend to go away for ever. I screamed with joy and started to sing loudly, "Tomar dekhha naire tomar dekhha nai.." – haven't seen you for a long time. Where have you been all these weeks? My wife woke up with my song and commented whether I saw a bhoot or a ghost. She lost interest when I told the truth and went back to sleep. However, I grabbed my camera and started to take photographs first without any flash, but then dared to use it when my eight-legged friend with perhaps eight eyes tolerated all these intrusions. She was an ideal model compared to many of my other friends. For the first time I took a selfie together with my tiny friend as can be seen in Fig. 1. Using close ups, I could clearly see her two fang of chelicera, four eyes at the top, claws and details of her violin-shaped abdomen. Single-lens-reflex digital cameras allow the opportunities of inspecting the qualities of photographs and specially the macrographs. After satisfying myself with the shots, I decided to say good night to my friend wishing her happy hunting.

Figure 2. Three of my beautiful children of the dawn

The morning twitting of a bunch of male Cardinals in our garden always act as wake-up calls for me every morning long before the sunrise time. This is also the best time to watch the Skunks digging for grubs. There were occasions when I watched the little Skunk-babies either obediently following the mother or venturing out a bit (Figure 2). The cardinals, of course, fly around the apple and black-walnut trees in our backyard. It is a joy to watch and listen them singing; they truly are song-birds. After the sunrise, they seem to enjoy the fun to pose and show off their profiles for my camera as can be seen in Figure 3.

Figure 3. Cardinals in my garden love the attention I pay to them and pose for my camera to show details

Figure 4. Stirling interested in stealing materials from Robin's nest had to be watched all the time

Every year a Robin family builds a nest on the outdoor light and they have to protect it from Starlings (Fig. 4). Butterflies and bugs, and the little birds always draw my attentions (Fig. 5). However, the most interesting are the little red squirrels and the tiny chipmunks of my garden. Both of them are very aggressive and chase the big brown or black squirrels. For my photography I have erected a wooden post very close to our patio door near the kitchen table. Birds love this post. Red squirrels and the chipmunks take turn to use this post as their observation tower for keeping eyes on intruders and come down to chase them away (Fig. 6). I have not yet figured out how they manage to share this surveillance post.

Figure 5. While a monarch butterfly with a friend of different colours keep landing on different flowers, a finch sat on the observation tower to keep an eye on the cricket munching leaves of a rashpberry bush.

.

Figure 6. Black squirrels get the black walnuts from the huge tree in my garden, peel the green lemon flavoured skin off in about 50-70 seconds, depending on their experience and individual cleanliness (I mean it from my observations), to get the nuts and hide them under the leaves - under the watchful eyes of the chipmunks or the red squirrels making notes of the whole operations from the observation tower.

Figure 7. Chipmunks cannot sit idle for a moment. They have to groom their fur all the time or keep scratching one thing or the other all over their body; scratch, scratch and more scratches – all the time, except, perhaps during their meal time or observation duties and chasing the big brown or black squirrels.

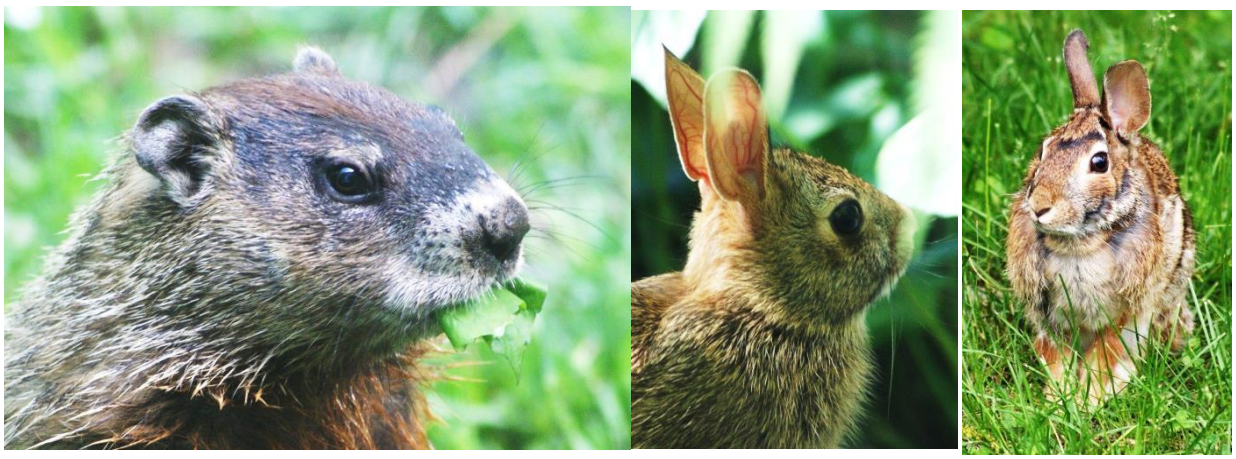

Figure 8. Ground hog munching spinach leaves (left) and a mother bunny just relaxing after a good meal and probably telling her baby to sharpen his ears (right)

Figure 9. Mr. Dove sits on the roof enjoying activities in my garden while Mrs. Dove keeps an eye on him

Growing vegetable, except for hot peppers, in my garden has become an impossibility. The groundhogs and the wild bunnies (Figure 8) consider my vegetable garden as a big buffet. They consider me as their slave farmer and are never afraid of munching the tender leaves of all the items in the garden. Mr. and Mrs. Dove are indifferent to all the wild activities in my garden. I have not seen them eating anything yet.

Ganges Cruise

Yogadhish Das

During my last visit to Kolkata in 2019, I took a sunset boat cruise on the Ganges operated by Vivada. Many of you may have taken the same cruise. The boat left from the Millennium Park just before sunset, sailed to Belur and returned well after dark. The boat sailed past many of the iconic sites and landmarks of Kolkata. Here are some of the photographs I took during this cruise. Photographs were taken from a moving boat in low light.

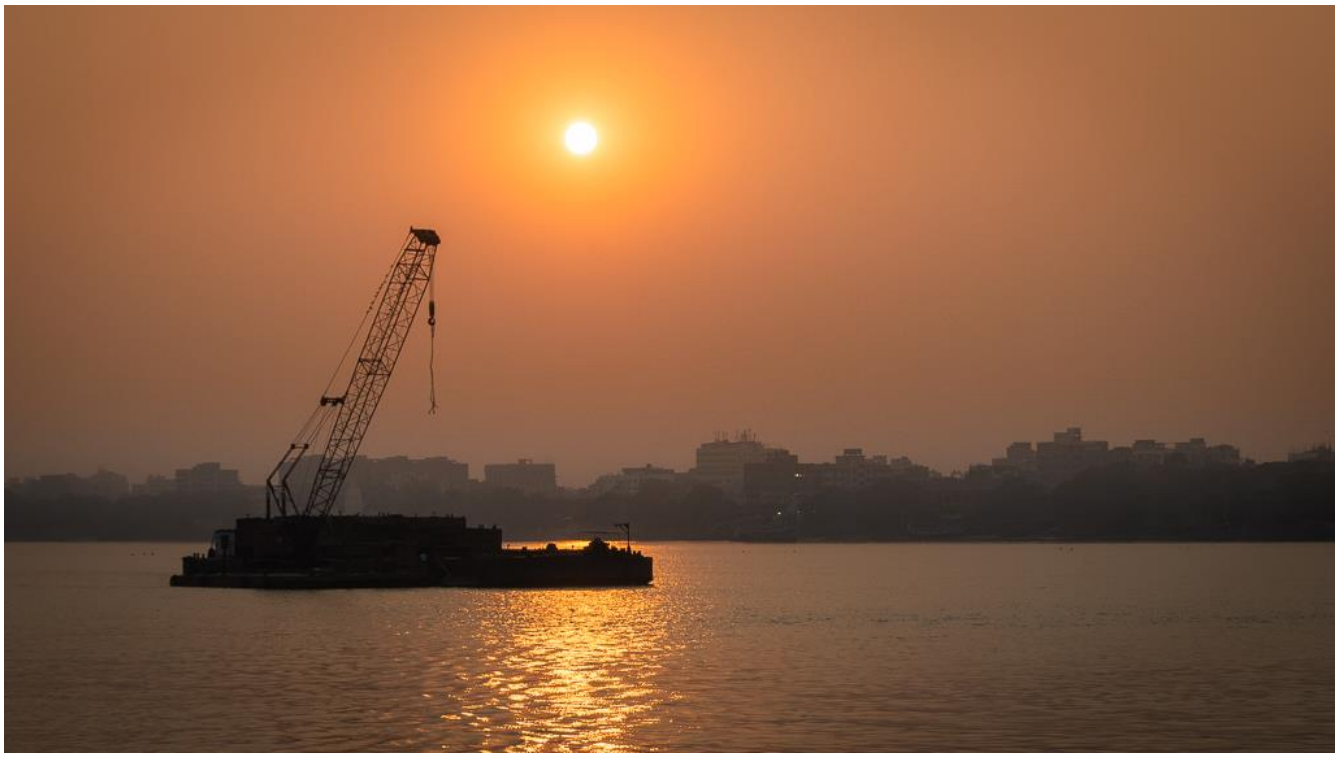

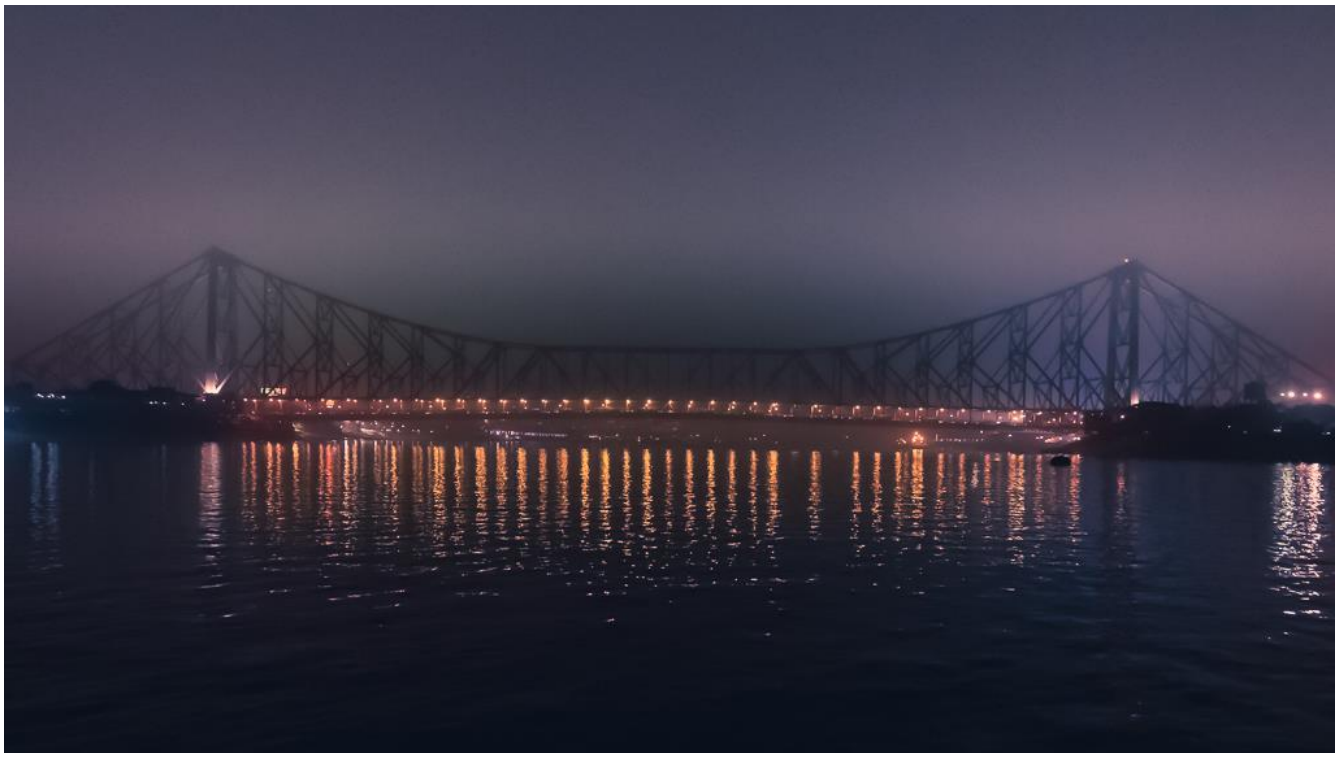

Sherlock Holmes in Old Town, Riga

Subhalakshmi Basu Ray

On a cobbled street, fronted by characterful mansions, in the Latvian capital's Old Town, is Sherlock Holmes Art Hotel. Mounted on a wall, beside the grand porte cochere, which leads on to a private courtyard, is an impressive bronze bust of Sherlock Holmes. The entrance of the hotel is off the courtyard. The address reads 221b Baker Street!

Sherlock Holmes in Riga

The handsome, five storied building of the hotel, was constructed in 1898. A world away, Sir Arthur Conan Doyle had already published “A Study in Scarlet” in 1887, where the character of the legendary detective was first introduced, appearing in successive stories till his “demise” in 1893, in the infamous plunge down the thundering Reichenbach Falls in the Swiss Alps, which had his devoted fans up in arms!

Predictably, Sherlock Holmes Art Hotel in Old Town Riga, which opened its doors in 2017, has a Sherlock Holmes theme. All seventeen of its rooms, some with splendid views of the landmarks of the historic city, are steeped in Victorian elegance.

Interestingly, Riga’s fascination with the adventures of the quintessential British sleuth goes back to Soviet times and was shared by the rest of the USSR. It was largely fueled by the popular made for television, Russian movie series, directed by Igor Maslennikov, which first aired in 1979. Starring the renowned Russian actor Vasily Livanov in the lead role, eleven episodes in all were made between 1979 and 1986. The series were mostly filmed in Juaniela Street in Old Town Riga, a stone’s throw away from Maza Monetu Iela 3, where Sherlock Holmes Art Hotel is situated.

Dame Jean Conan Doyle, the daughter of the physician turned author, had once remarked that her father would certainly have approved of Livanov’s characterization of Holmes. Indeed, for his masterful portrayal of the character of the fictional British sleuth, Vasily Livanov was awarded an honorary MBE (Member of the British Empire) by the British monarch in 2006, one of the august few Sherlock actors to receive such an honour. Benedict Cumberbatch won a CBE (Commander of the British Empire) for the same role in a British production in 2015. Today, Livanov’s photograph, in a classic pose, is prominently on display at the Sherlock Holmes Museum in Baker Street, London.

An annual Sherlock Holmes Festival has been held in Riga every year since 2011, on or around his supposed date of birth, the 6th of January, drawing Sherlock aficionados from near and far. Victorian costume parades, tea parties with “Mrs. Hudson”, retro photography salons and guided tours of the locations where the popular series were shot are some of the highlights of the annual celebration. Needless to say, Riga’s love affair with Sherlock Holmes continues unabated!

Madhya Pradesh the Land of Splendors

Mandu

Subhash C. Biswas

History often pulls us back to the stunning tales conserved in its custody. One such tale is about the incredible city of Mandu, a history-buff's dream, a city that no traveler interested in India should miss. Mandu in its prime time was not only a prospering kingdom, but also a place of unfathomable beauty. Bestowed with luxurious vegetation, charming lakes, brooks and torrents, Mandu was styled as the beauty spot of Malwa. The Muslim rulers of those days were so fascinated by the glamour of Mandu that they named it *Shadiabad* meaning "the City of Joy". Indeed, Emperor Jahangir said there was "no place so pleasant in climate and so pretty in scenery as Mandu".

Today's Mandu city often regarded as the Hill Fort of Mandu used to be enclosed within fort walls. It existed before 555 AD when it was called *Mandapa-Durga*. A Sanskrit inscription found inside this Durga (Fort) on the pedestal of an image of Adinath has this date on it. According to the celebrated historian Firishta, this fort was built by some Anand Deo Rajput. The Sanskrit name Mandapa was pronounced Mandava in Prakriti. The city is still popularly called Mandava which has been further corrupted to Mandu.

After a few invasions by Muslim rulers such as Iltutmis in 1227 AD, Jalal-ud-Din Khilji in 1293 AD and finally Ala-ud-Din Khilji in 1305 AD, the great city of Mandu was appended to the Sultanate of Delhi. During the reign of Muhammad-bin-Tughluq, his deputy Dilwar Khan Ghuri governed Mandu. His son Hoshang Shah ascended the throne in 1405 AD and shifted the capital from Dhar to Mandu. Despite his continuous engagement in strenuous wars with the neighbouring states, he displayed enough fondness for architecture by building stately monuments that include his own tomb, the Delhi Gate and Jami Masjid. His achievements have been eloquently elaborated by Firishta and Emperor Jahangir. During his reign, Malwa rose to be a great prosperous kingdom. His ingenuity was legendary; an interesting story stands in testimony. Hoshang wanted elephants from the King of Orissa of his time. But the King would never give him any at any cost. So Hoshang adapted a clever tactics. He went to Orissa in disguise of an ordinary merchant carrying with him a team of excellent grey horses, the kind that the King of Orissa always desired to have. Arriving in Orissa, Hoshang invited the King to see his horses for trading. The unsuspecting King responded to the invitation and was captured promptly. Hoshang Shah released the King only when he promised to give him one hundred of his best elephants and guaranty his safe exit from Orissa. Hoshang thus marched back to Mandu with the treasure of elephants in triumph without any bloodshed.

After his death, his descendants ruled until 1542 AD when Sher Shah invaded and conquered Malwa. But he left the kingdom to be governed by his deputy Shuja'at Khan. After Shuja'at, his son Malik Bayazid ascended the throne and ruled with the title Baz Bahadur until 1561 AD when Malwa fell to the Mughals of Delhi. Finally, Malhar Rao Holkar defeated the Mughal governor Diya Bahadur and the state remained under the Marathas until the British rose to power.

The road to Mandu passes successively through Alamgir Darwaja, Bhangi Darwaja and then through the main entrance to the Fort called Delhi Darwaja. The Delhi Darwaja faces toward the direction of Delhi. The driver Muhammad says, "Sir, we're now in Mandu and will reach the resort hotel in a few minutes."

"Ok, then drop us there," says Godadhar. "We'll rest for about an hour and then go for sightseeing."

After an hour Muhammad comes back with a guide. "Sir, I've found the best guide here," he says. "See if you like him."

"If you say he's the best, best he'll be for me. I trust you."

"Sir, my name is Yoginath Parmar. I've been working here as a guide for the last ten years. I'll be happy to give you my best service."

“Thanks, Mr. Parmar. I accept your service.”

“You may call me Yogi, short and simple.”

“Yogi, are you a descended of the famous Paramara dynasty who ruled Malwa long time ago?”

“Yes Sir, I am and proud to be. But that blue blood has lost its glamour over the centuries.”

Muhammad drives to a suitable place from where the sightseeing begins. Yoginath starts his initial talk about the Mandu monuments. The architecture of these monuments, unlike other monuments elsewhere in India, has a distinctive character. The Muslim rulers built the majority of these monuments during the period from 1401 to 1526 AD. As they did elsewhere in India, these rulers resorted to the destruction of Hindu temples and advantageously utilize the materials for building their mosques and tombs in compliance with their own architectural styles. This method of building was quick, easy and cost-effective; but it lacked in quality and sophistication. Visitors will be disappointed if they expect to see intricate carvings, beautiful sculptures and decorative motifs on the walls and pillars. Instead they may be pleasantly impressed by the simplicity, austerity and massiveness of construction.

A colonnade in Jami Masjid

The monuments in Mandu - numbering about seventy-five - may be classified in seven groups. (1) Ancient Monuments, (2) The Royal Enclave, (3) The Central Group, (4) The Sugar Talao Group, (5) The Reba Kund Group, (6) The Darga Khan Group and (7) The Group of Other Scattered monuments. “We’ll visit,” the guide says, “as many as the time and energy permit starting with the Central Group, as we’re standing right beside a major monument of this group, the Jami Masjid.”

The Central Group - Jami Masjid

It is a historic mosque located in the centre of the city. An inscription on the doorway of the porch says it was designed after the great mosque of Damascus. This doorway and the lintel have some carvings that are reminiscent of Hindu architecture. The entire construction stands on a plinth 4.6 m above the ground level. Construction of this mosque was started by Sultan Hoshang shah Ghuri and completed by Mahmud Shah Khilji in 1454 AD. Of all the monuments in Mandu, this mosque stands out as the most impressive one.

Guide Yoginath suggests, “Let’s climb up the stairs of the Ashrafi Mahal to get the best view of the mosque.”

Hoshang Shah's Tomb beside Jami Masjid

Ashrafi Mahal is another monument just across the street. They climb up the stairs and stand on the high platform and look at the mosque.

"You're right, Yogi, we get a wonderful sight of this monument. We can see three huge domes with much smaller domes lining up in front," says Godadhar. "The façade is really an imposing view, no doubt about it," adds Kamalika.

"What I feel most you know is that the stark simplicity of the architecture of the mosque overwhelmingly manifests highly impressive spirituality."

"I understand what you mean. The miniature domes beside the much larger ones express a feeling of humbleness before the almighty god."

"Right indeed! This high level philosophy is amazingly revealed through impeccable simplicity."

"Shall we now go inside the mosque?" says Yoginath.

The interior of the porch is a spacious hall with beautiful *jali* (carved lattice) screens on the sides. Bands of blue enamel tiles decorate the top of these screens. The courtyard of the mosque is spacious; it is beautifully landscaped with simple design that goes in harmony with the overall simplicity of this magnificent monument. It is enclosed on all sides by huge colonnades with arches and pillars. Some Hindu influence is noticed in the jambs that have polished black stones with carvings of Hindu designs. More traces of Hindu influence are noticed in the elegant marble domes supported on arches with brackets and balustrade. "Now let's go round the mosque to its rear where we'll see another spectacular monument – the Tomb of Hoshang Shah," proposes Yoginath.

Tomb of Hoshang Shah - -Construction of this tomb was started by Hoshang Shah himself. But he died in 1435 AD before finishing it. It was later completed by Mahmud Shah Khilji in 1440 AD. It is located to the west of Jami Masjid. Reputed to be the first marble mausoleum in India, this grand tomb is a square structure resting on a plinth crowned by a central dome that is adorned with small turrets of conical shape at the four corners. The finial of the dome is a crescent that was probably imported from Persia or Mesopotamia. The tomb is constructed with white marble which is beautifully decorated with carvings of floral motifs and blue enamel stars.

Jahaz Mahal

The entrance to the tomb is through a porch that has arched openings with artistic design. The floor of the domed interior is a stoned pavement in the middle of which stands a mausoleum on a square marble platform. The main sarcophagus of Hoshang Shah is carved as a casket with receding bands. There are a few other graves three of which are in marble. Light enters through stone *jalis* of geometric design, which provides appropriately subdued illumination on the graves. Influence of Hindu architecture is quite evident in the design of pillars and brackets.

This tomb is one of the remarkable examples of Afghan style of Islamic architecture. Shah Jahan visited Mandu twice as a prince; according to an inscription in this tomb, he deputed four of his court architects to Mandu in 1659 AD to pay homage to the tomb's builders. Ustad Hamid who was closely associated with the construction of the Taj Mahal was one of those four architects. This leads one to believe that Mughal architecture including that of the Taj Mahal was influenced by the architecture of this tomb.

"We've seen the monuments of the Central Group," says Yoginath. "Now let's proceed to the Royal Enclave. This complex has more monuments than the Central Group. You've to buy a ticket, but that's just one ticket for all the monuments in this group."

"Is it within walking distance, Yogi?"

"No sir, we need the car."

The Royal Enclave – Jahaz Mahal

Jahaz Mahal is the most glamorous monument in the Royal Enclave and is the most popular among tourists. During the prime days of Mandu, Jahaz Mahal was hailed as the most beautiful palace where the Muslim rulers profoundly indulged in amusement and romance.

This marvelous monument is built on a strip of land between two waterbodies – Munj Talao and Kapoor Tank – giving it an appearance of a ship anchored in between them. The monument was built as an assembly hall. Standing in front of the building, one sees a spacious terrace that can be approached by a long flight of stairs. The bewildered tourists keep on gazing at the delightful scene consisting of the staircase and the pavilion with domes and turrets. The ground floor of the building has three large halls connected with corridors and narrow rooms at the extreme ends. There is a beautiful cistern at the northern end, which is surrounded by a colonnade on its three sides. The central hall has a dome-shaped ceiling adorned with

blue and yellow tiles. Emperor Jahangir in his memoirs has lucidly described his pleasant experience of being entertained in this palace.

Coming out of Jahaz Mahal Kamalika expresses some disappointment about this monument. “I’ve heard a lot about this ship-like building, but such beauty is not apparent to me,” she says.

Hindola Mahal

“Madam, if you want to get the most spectacular view of Jahaz Mahal, you’ve to see it from the terrace of that palace there, Taveri Mahal, during the rainy season when the two tanks on both sides are full to the brim and the surroundings are buried in lush green. You’ll then see the building like a ship in water. You know Emperor Jahangir and Queen Noor Jahan resided in this palace and enjoyed the profusion of beauty of this place.”

“I see, I can imagine the royal fancy and romanticism with natural beauty.”

“One thing you may notice here, Sir and Madam,” Yoginath points out, “that the surfaces of the walls and roofs of the monuments in this complex are covered with a thick layer of plaster and not stones like in Jami Masjid and the Tomb.”

“Right indeed! Now what’s our next move?” asks Godadhar.

“We’ll go to see Hindola Mahal.”

Hindola Mahal

This unique monument was probably constructed during the reign of Ghiyas-al-Din, son of Mahmud Shah. Architecturally, it is a T-shaped building with rugged side walls which are 2.7 m thick and further reinforced by massive sloping buttresses. This inclined support was probably designed to bear the excessive thrust of the lofty arches that once supported a huge vaulted ceiling above. The head of the T was, as it appears from the exterior, a later addition. The main hall has six arched openings on both sides, above which there are windows with decorative patterns. Although the vaulted roof has disappeared, the row of lofty arches that supported it is still there intact bearing evidence of what they once carried overhead.

Baz Bahadur's Palace

The sloping masonry gives a feeling of swinging and that is how this building was named. Hindola Mahal literally means a "Swinging Palace".

"I wonder who came up with this name for this Mahal," remarks Kamalika.

"I don't know Madam," replies Yoginath.

"Whoever named it," says Godadhar "must have had a poetic mind. That apart, what strikes me most is its one-of-a-kind architecture. Simplicity, massiveness and beauty, the basic elements of Mandu's architecture, are glaringly obvious in this exclusive monument. I salute the designer!"

The Rewa-Kund Group – Baz Bahadur's Palace

Malik Bayazid Baz Bahadur Khan (1555 to 1562 AD) succeeded his father Shuja'at Khan who was the governor appointed by Sher Shah. Sultan Baz Bahadur was the last independent ruler of Malwa. His palace, an interesting blend of Rajasthani and Mughal styles of architecture, was built in 1508-09 AD by the Khilji Sultan Nasir-ud-Din Shah. Baz Bahadur occupied it and brought in some renovation and addition. Kamalika and Godadhar walk around on the terrace and enjoy the surroundings that mesmerize them and carry them back to the days of Baz Bahadur. They can see the Rewa Kund down below and the Roopmati's pavilion on the hill. "You know Malika; this pleasant late afternoon sun, this beauty and those marvelous monuments overwhelm me. They make me feel like I'm Emperor Jahangir!"

"Your majesty, Janhapana! But I'm not feeling like Noor Jahan," Kamalika quips with a taunting smile.

"Let's go down. Our guide is waiting there."

"I know there's an interesting legend about Baz Bahadur and Roopmati," says Kamalika.

"Yes Madam, there's one and very interesting," responds Yoginath.

"Can you tell me about it please?"

"Sure, I can. Once on a hunting mission on the bank of the river Narmada, Baz Bahadur got separated from his retinue. While wandering alone there, he heard a sweet melody coming from a grove. Baz was very

fond of music; so he approached the spot and was surprised to see a beautiful maiden surrounded by deer and birds. Baz Bahadur, bewildered and amazed, got attracted by her serene beauty and sweet voice. He immediately fell in love with her and proposed. Roopmati did not say no outright, but imposed a condition. If Baz Bahadur could bring the holy river Narmada to Mandu, she would accept him. Baz agreed. But he hardly realized how formidable task it was to make the river flow uphill. He was puzzled and almost broke down when he figured out the impossibility of fulfilling the condition. Yet he could not forget Roopmati. He started to pray to Narmada. At this point, river Narmada took pity on him and appeared before him. She revealed to him the secret for fulfilling Roopmati's condition. Following the direction of Narmada, Baz Bahadur, the King, found a sacred tamarisk tree in Mandu. He excavated the place near the tree and amazingly, water that resembled the water of Narmada with its divinity, sprang up and formed a tank. That was the Rewa Kund. Roopmati was satisfied and married him."

Roopmati's Pavilion

"Roopmati was a great singer," says Kamalika.

"Yes, yes, she was. Mandu became a centre for musical composition during her time. You probably know the Ragini Bhup Kalyan. It was composed by her. The local balladeers still sing songs of the Baz-Roopmati romance. Roopmati is highly acclaimed in the folklores of Malwa. When Baz Bahadur got captured by the Mughals, Roopmati poisoned herself to save her sanctity offering her final love to her beloved. This brought a sad end to this epic love story."

"Umm---," utters Godadhar with a sigh, "I know her poems were translated in English – *The Lady of Lotus: Rupmati, Queen of Mandu*."

Beyond the palace of Baz Bahadur to its south on a hilltop is situated Roopmati's pavilion. The original building was constructed as a military post. It was later remodeled and renovated in different periods to convert it to a palace. The pavilions on the terrace are the most aesthetic and distinctive parts of the palace. They are like hemispherical domes standing on a square base. Roopmati, it is believed, used to come to these pavilions often to have a vision of Narmada which was visible from here on a clear sunny day.

This is the abridged version of an article from my future book: India the Land of Gods Vol.2. All the photos are taken by the author.

Reclaiming Indigenous Culture on a Canvas

Reeto Ghosh

In *Battling Indigenous Stereotypes through Badass Art*, Jay Soule shares the story of an Indigenous artist who is trying to reclaim Indigenous stories and identities through his art. Jay Soule, also known as Chippewar, is an Indigenous artist who is combating cultural appropriation by placing Indigenous characters in European movie posters. In his video interview, Soule proceeds to explain how sports teams, such as the *Washington Redskins,* and fashion brands, such as *Yeezy* use aspects of Indigenous culture for profit while utilizing inaccurate depictions of Indigenous peoples.

To raise awareness about Indigenous culture, Soule paints Indigenous characters in European movie posters as a mechanism to remove Indigenous misrepresentation and raise awareness against cultural appropriation and stereotyping of Indigenous Peoples in the entertainment industry. According to Soule, "The Hollywood Indian has always been portrayed as the monster". In his art, he deliberately thought of taking European stories and giving them an Indigenous twist, which he calls "reverse cultural appropriation". This strategy is effective since visual art forms (such as clothing) enable widespread recognition and support against cultural appropriation.

Through his art, Soule is reclaiming the Indigenous identity to address the historic legacy of Indigenous misrepresentations in North America. Soule explains that the European stories about Indigenous characters are in many ways European interpretations of Indigenous Peoples, based on the way they interacted with Indigenous Peoples. Therefore, by paintings the posters with Indigenous characters, he helps to fortify that at one point, these were their own Indigenous stories. It also shows that given equal opportunity, Indigenous filmmakers and storytellers are able to create posters and movies of their own and also reclaim their identity. Soule also uses his artistic platform as a means to educate his customers, and he explains how his artwork is different than someone like Kanye West, who inappropriately uses Indigenous depictions for the sake of style without any respect for what the imagery means or where it comes from. Soule also explains that by supporting his work "you're supporting Indigenous business, you're supporting entrepreneurship, and you're supporting my artwork." Furthermore, he helps to identify that cultural appropriation becomes wrong when it is done without respect for its origins and is instead done for making a product or a person attractive

or more profitable. This helps to solidify the fact that Soule is using posters to draw attention against cultural appropriation and through his artwork, he is bringing the true representation of Indigenous identity.

Source:

CBC Arts (2017)*Battling Indigenous Stereotypes through Badass Art. Retrieved via https://www.youtube.com/watch?v=azN2BvyPJdc*

My foray into nature

Oishee Ghosh

As I walk out to the trail near me,
I stop and stare as I see this lone red tree - towering over me.

The leaves appear to already be tinged with the fall hue,
Even though falls feels almost like spring came anew.

The sun peers through the leaves of green,
Reaching me,
As I stare at this lone red tree.

The lens of my camera can't seem to capture,
This perfectly normal,
Yet almost otherworldly
Scene before me.

Renewed by the cool fall air,
The warm glow of the sun during golden hour,
I decide to run further down the trail -

Feet pounding on gravel,
Wind running through my hair -
I finally understand,
Why dogs move without a care!

Soon I reach a bridge,
Under which a stream of water passes through,
Complimenting the view.

I see reflections of the sky and the trees
I see leaves dancing on the water with the cool breeze as a guide,
I see branches floating above and reflecting below,

All as I wait and see what is to follow.

I continue on,
Reaching a nice panoramic view of the sunset.
A 360-degree view,
Brighter than any TV screen may bring through.

I take some more pictures,
Because I have never heard anyone bicker,
Over having too many pictures of the sun and nature.

At last I reach another trail
With trees creating a roof,
A carpet of leaves padding the ground.

Out of the corner of my eye I notice an orange tree at the far end,
Appearing to have begun its transition to the eventual winter slumber,
I walk more down the trail before deciding to turn around -
Perhaps I'll bike through the rest next time.

On my way back I pass by some yellow flowers -
And decide to crouch as I take one last picture,
With my camera gazing up,
To let them touch the sky.

And now I continue back home,
Excited to return again later -
To continue
My foray into nature.

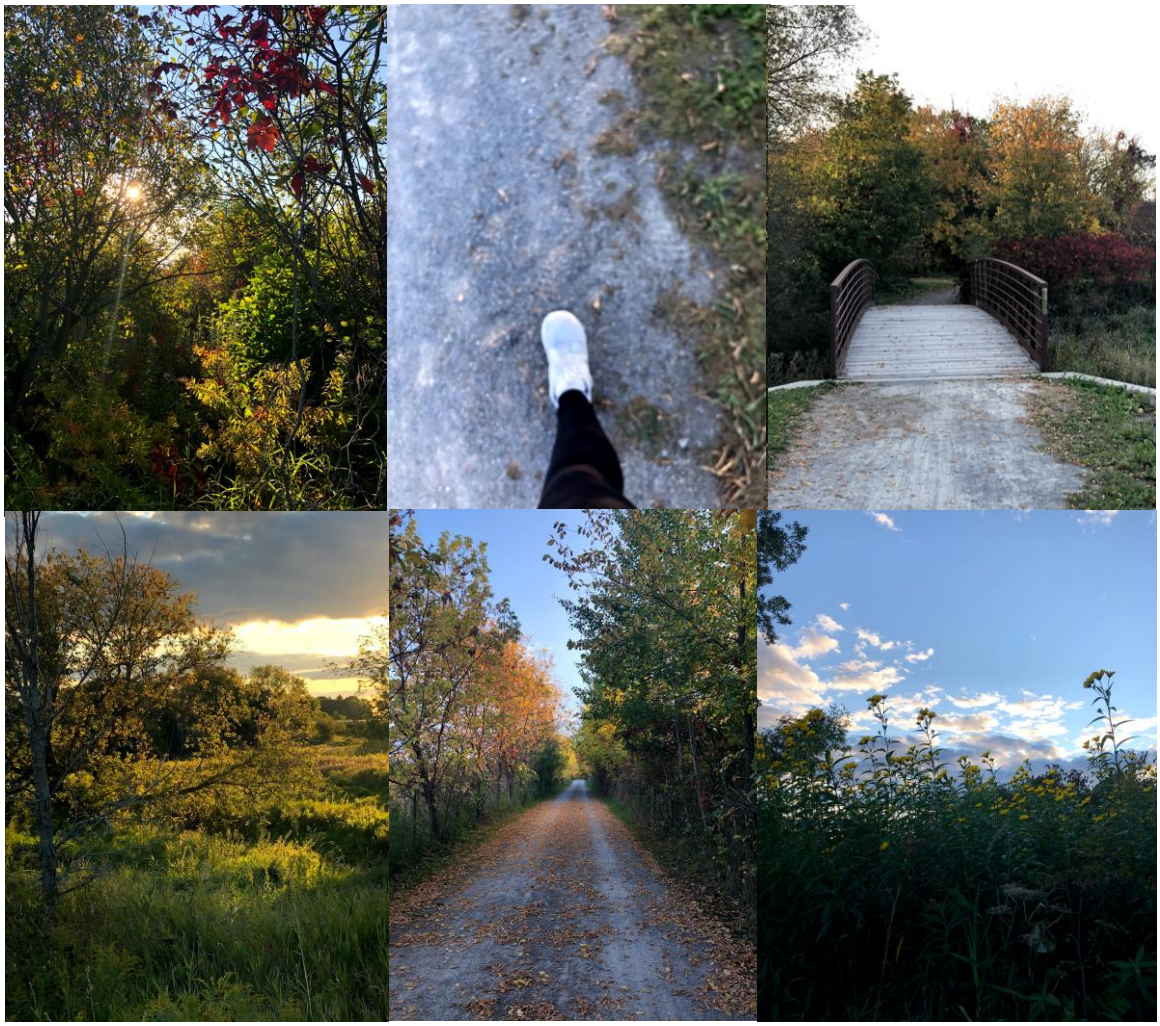

Alpona

Nirmal Kumar Sinha

কোথায় গেলে তারে পাবো

দেবব্রত মুখার্জী

Lily – acrylic on canvas

Arun Shankar Roy

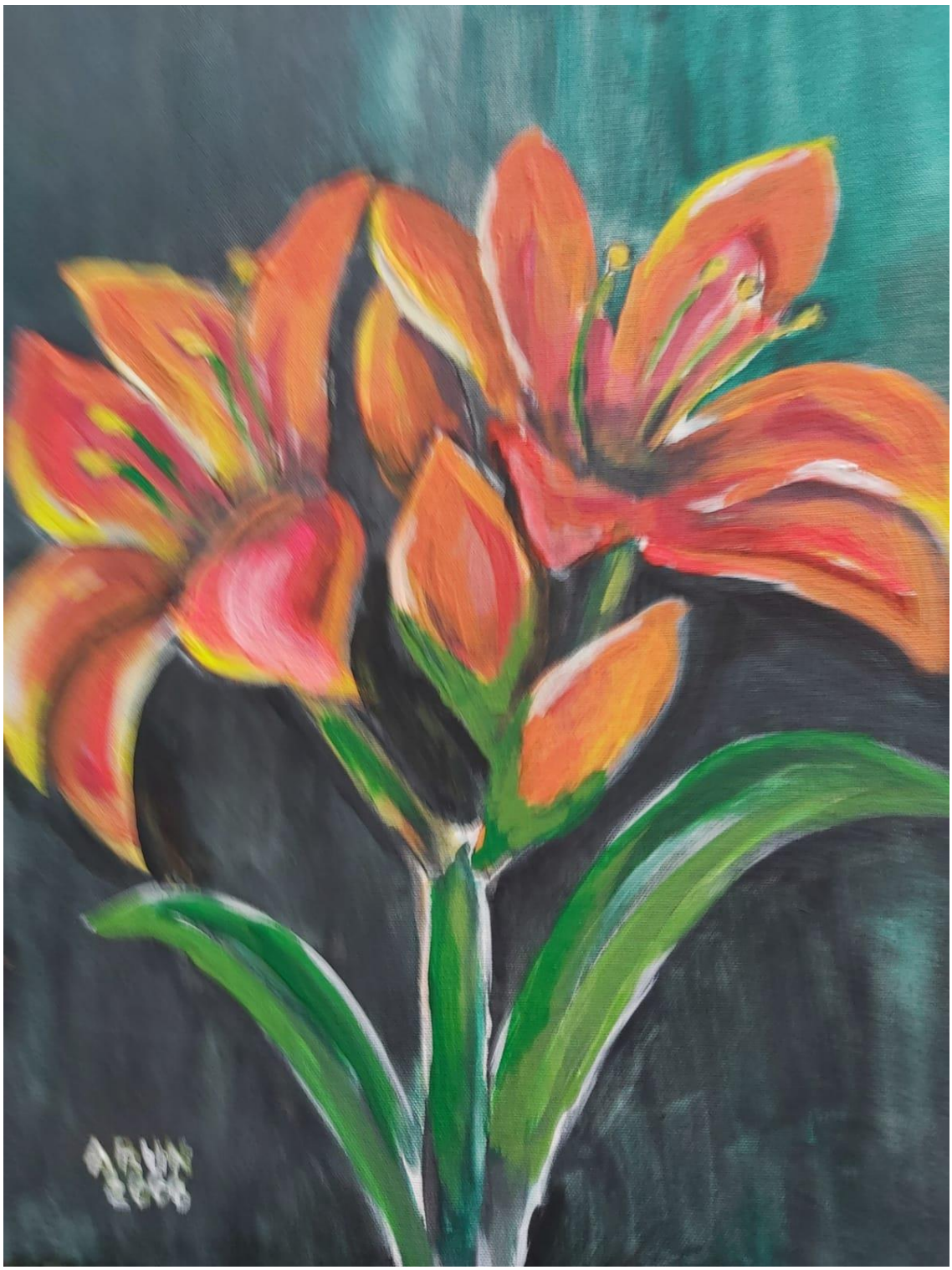

A Man of Conscience

Reeto Ghosh

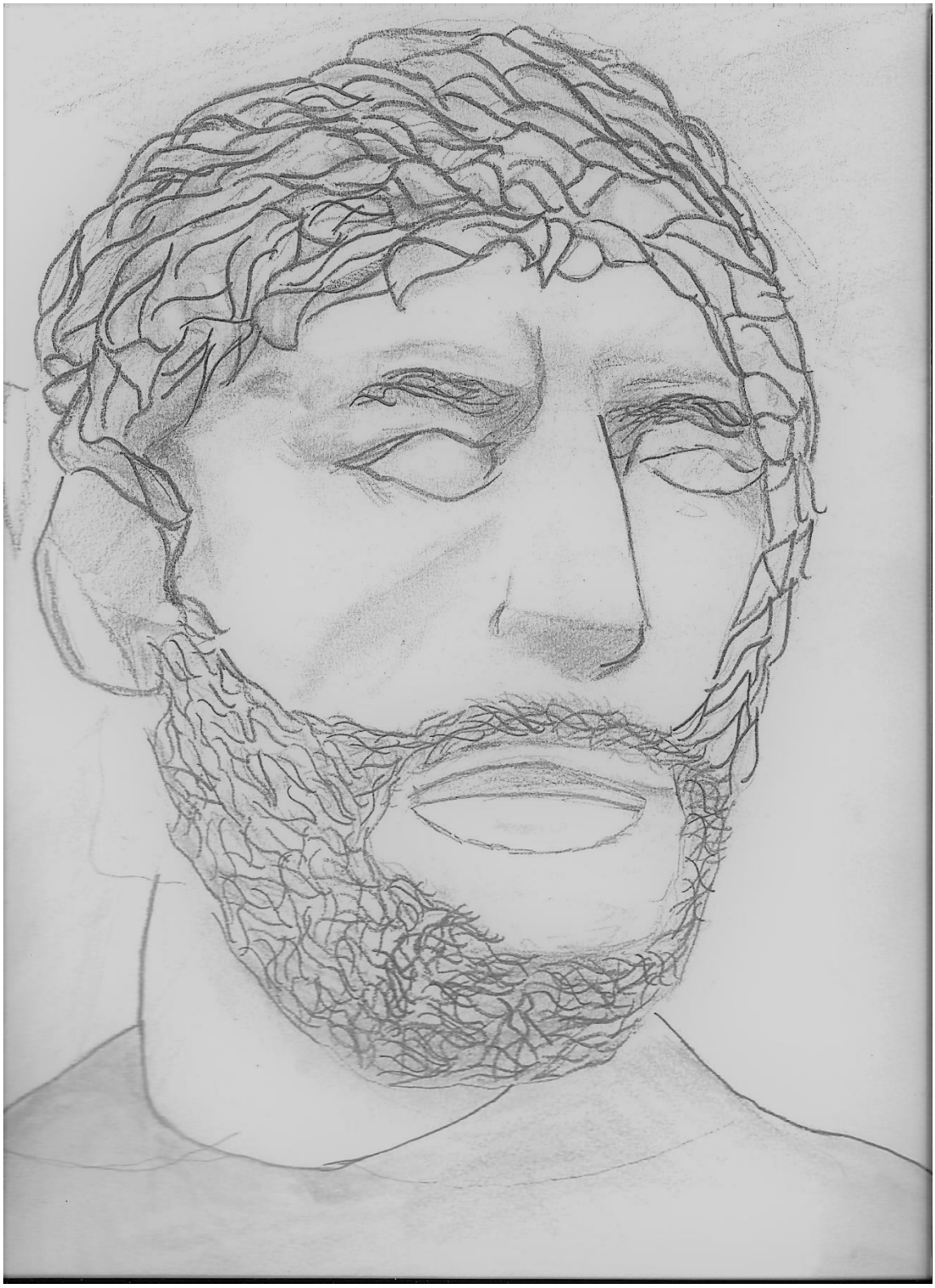

Laugh your heart out

Various collections

-বুঝলে ডাক্তার, হপ্তায় হপ্তায় করোনা টেস্ট করাতে জলের মত টাকা খরচ হচ্ছে।

- সে কী? প্রতি সপ্তাহে টেস্ট! আমি তো বলিনি করাতে! কার অ্যাডভাইসে করাচ্ছো হে।

- ফি হপ্তায় তিন হাজার টাকা গচ্চা যাচ্ছে।

- বেশি নিচ্ছে। আড়াই হাজারে রেট বাঁধা তো! ডাহা ঠকাচ্ছে দেখছি।

- না, ফুল ফ্যামিলি প্যাকেজ। ধরো, এই চার জনের মত।

- সে কী, এত সস্তায় চারজনের? বাড়িতে এসে স্যাম্পল নিয়ে যায়?

- না না, আমাকেই নিয়ে আসতে হয়!

- নিয়ে আসতে হয়? কী নিয়ে আসতে হয়?

- মানে, ইয়ে বাজারের বাকেরালির কাছ থেকে দেড় কিলো ওজনের ইলিশ। প্রতি উইকে একটা করে।

- ইলিশ আবার এলো কোত্থেকে? এই না বলছিলে করোনা টেস্ট!

- আমি বলিনি ভাই! ওই বাকেরালি বলেছে।

- বাকেরালি করোনা টেস্ট করাতে বলেছে? কী আশ্চর্য!

- দ্যুৎ, তা কেন? বাকেরালি বলেছে, ওর দেওয়া ইলিশে যতদিন গন্ধ পাব, বাড়ির সবাই... বুঝতে হবে করোনা হয়নি। গন্ধ না পেলেই করোনা পজিটিভ। কী আর করা, বাধ্য হয়েই ওই প্রতি সপ্তাহে তিন হাজার টাকা দামের ইলিশ...

আজকে একটি নিরামিষভোজী দের ফেসবুক পেজে একজন লিখেছে- "নিরীহ পশুদের মেরে খেয়ে বাহাদুরি দেখাবেন না। বাঘ সিংহ মেরে খেয়ে দেখান তবে বুঝব আপনি কত বড় বাহাদুর"!

আরেক জন তাতে কমেন্ট দিয়েছে - " সামান্য শাক পাতা খেয়ে বাহাদুরি দেখাবেন না। আগে একটা গোটা বটগাছ খেয়ে দেখান,তারপর বুঝব আপনি কেমন বাহাদুর "!!

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ল শ্রদ্ধেয় উৎপল দত্ত বলেছিলেন, শাক পাতাই যদি খাব তবে আর কষ্ট করে গাছ থেকে নামলাম কেন...

আত্মার মৃত্যু হয় না, কেবল শরীর বদল করে"।

"নেতাদেরও মৃত্যু হয় না, কেবল দল বদল করে"।

কিছু মানুষের ব্রেন..

আর পৌরসভার ড্রেন...

কোনোদিন পরিষ্কার থাকে না...

একটা কথা আজও বুঝতে পারলাম না যে গরিবদের জন্য লড়তে লড়তে নেতারা বড়লোক কি করে হয়ে যায়।

আচ্ছা সবাই বলে মদ খেলে...নাকি সবাই সত্যি কথা বলে...তাহলে আদালতে গীতা না ছুঁয়ে

দু পেগ মদ খাইয়ে দিলেই তো হয়...

ভাবছি রেলস্টেশন-এ পালিয়ে যাব,,

কারণ সব Talented মানুষগুলো রেলস্টেশন থেকেই উঠে আসছে,

1- মোদী 2- ধোনি 3- রানু মন্ডল।.

Venkat went to a bank to open a S.B. A/C.

After seeing the form he went to Delhi for filling it up.

You know why?

Form said: 'Fill Up in Capital.'

Venkat standing below a tube light with open mouth.

Why?

Because his doctor advised him: 'Today's dinner should be light!'

On romantic date Venkat's gf asks him:

'Darling ! On our engagement will you give me a ring?'

He said: 'Sure! What's your phone no.?'

Venkat found the answer to the most difficult question ever.

What will come first, chicken or egg?

what ever u order first will come first.

Teacher told all students to write an essay on a cricket match.

All were busy writing except Venkat

He wrote:'Due to Rain, No Match!'

What does Venkat do after taking a Xerox?

He will compare it with the original for any spelling mistakes.

Venkat & wife buy coffee in a shop.

Venkat: Drink quickly before it gets cold.

Wife: Why?

Venkat: Hot coffee $5 and cold coffee $10.

What happens when Venkat's wife delivers twins????

He does not sleep whole night, thinking who is the father of the second child...

Manager asked Venkat at an interview.

Can you spell a word that has more than 100 letters in it?

Venkat replyed: -P-O-S-T-B-O-X.

After returning back from a foreign trip, Venkat asked his wife,

Do I look like a foreigner?

Wife: No! Why?

Venkat: In London a lady asked me Are you a foreigner?

Lecturer: write a note on Gandhi Jayanthi

Venkat writes, "Gandhi was a great man, but I don't know who is Jayanthi.

Interviewer: just imagine you are on the 3rd floor, it caught fire

and how will you escape?

Venkat: its simple. I will stop my imagination!!!

Venkat: My mobile bill how much?

Call centre girl: sir, just dial 123 to know current bill status

Venkat: Stupid, not CURRENT BILL my MOBILE BILL.

Friend: I got a brand new Ford IKON for my wife!

Venkat: Wow!!! That's an unbelievable exchange offer!!!

Teacher: "What is common between JESUS, KRISHNA, RAM, GANDHI and BUDDHA?"

Venkat : "All are born on government holidays...!!!

Sir: What is difference between Orange and Apple?

Venkat : Color of Orange is orange, but color of Apple is not APPLE

বাঙালি যা ভাবে গোটা বিশ্ব তা শতাব্দী পরে ভাবে! ইংরেজরা লিখত School আর বাঙালিরা বলতো ইস্কুল। এখন গোটা বিশ্ব বুঝছে e-school এর গুরুত্ব, এখন সব স্কুলই e-school (ইস্কুল)

এক বাঙ্গালী ঠিকাদার আমেরিকা গেল তার বন্ধুর বাড়ি। তার বন্ধু সেখানকার ঠিকাদার। বাঙ্গালী ঠিকাদার তার বন্ধুর অনেক সুন্দর বাড়িটা দেখে জিজ্ঞেস করল-

বাঙ্গালী : বন্ধু এত সুন্দর বাড়ি, কিভাবে?

আমেরিকান : ঐ যে সামনে একটা ব্রিজ দেখছো?

বাঙ্গালী : হ্যাঁ।

আমেরিকান : ওইটার ১০% আমার পকেটে।

কিছুদিন পর আমেরিকান বন্ধু বাঙ্গালী বন্ধুর বাড়িতে এল। এসে পুরাই থ হয়ে গেল। এতো তার বাড়ির চেয়েও সুন্দর। তাই বন্ধুকে জিজ্ঞেস করল-

আমেরিকান : এত সুন্দর বাড়ি, কিভাবে?

বাঙ্গালী : ওইযে সামনে একটা ব্রিজ দেখছো?

আমেরিকান : কই, নাতো।

তিনটে মাতাল একটা

ট্যাক্সি কে দাঁড় করালো

ট্যাক্সিতে ওঠার পর ড্রাইভার বুঝতে পারলো ওরা সব মাতাল।

তখন ড্রাইভার ট্যাক্সিটা স্ট্রাট দিয়ে না চালিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখল।

এবার ষ্টার্ট বন্ধ করে দিয়ে বলল আপনাদের জায়গা এসে গেছে।

মাতাল তিনটে তখন ট্যাক্সি থেকে নেমে গেলো।

১ম মাতালটা বললো ধন্যবাদ

২য় মাতালটা ১০০ টাকা দিয়ে বললো এটা বকশিস।

কিন্তু ৩য় মাতাল ট্যাক্সির ড্রাইভারটাকে সপাটে একটা চড় মারল।

ড্রাইভারটা ভাবলো এ বোধহয় মাতাল না, তাই বুঝে গেছে।

ড্রাইভার তাও জিজ্ঞেস করলো কেন চড় ☹মারলেন?

৩য় মাতালটা তখন বললো এত স্পিডে কেউ গাড়ী চালায়!!

অ্যাক্সিডেন্ট হলে কি হতো !!

Rapid River, Quebec, Acrylic on canvas

Shila Biswas